২য় সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০১২ - এপ্রিল ২০১৩

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত সংবাদ বুলেটিন 'জুম্ম বার্তা' এর দ্বিতীয় সংখ্যা এমন এক পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যে সময়ে সারাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংঘাতময়। মানবতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বানচাল করার লক্ষ্যে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সারাদেশে তাণ্ডব চালাচ্ছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক ও নিরাপত্তাহীন। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় তথাকথিক সমঅধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি জবরদখল ও নারীর উপর পাশবিক সহিংসতা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী হিসেবে খ্যাত রূপায়ণ-তাতিন্দ্র গং অব্যাহতভাবে হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী অপতৎপরতা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। নিরস্ত্র-নিরীহ লোকদের অপহরণ করে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়সহ সন্ত্রাসী কায়দায় অপহৃতদের মুক্তি নিয়ে নানা উদ্ভট শর্তারোপ করছে। ইউপিডিএফ কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারিতে অপহৃত জনসংহতি সমিতির ৫২ জন সদস্য ও সমর্থক এখনো উদ্ধার হয়নি। অতি সম্প্রতি সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা লংগদুতে গণ-অপহরণ তাণ্ডবে মেতে উঠেছে। কিন্তু প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দেখেও না দেখার ভান করে প্রকারান্তরে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের অবাধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যেতে দিচ্ছে। ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা তাদের সশস্ত্র হীন তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে গত মার্চে ভারতের মিজোরামে ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের হীন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণের কাছে আরেকবার স্পষ্ট হয়েছে।

অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চললেও সরকার বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শিকেয় তুলে রেখেছে। তার অন্যতম উদাহরণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও উক্ত সভার কার্যবিবরণী এখনো পর্যন্ত লেখা হয়নি। অতি সম্প্রতি ২০১২ সালের নভেম্বর ও ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর পর দু' বার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আশাব্যঞ্জক কোন দিকনির্দেশনা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অধিকন্তু পার্বত্যবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর উন্মোচন করায় জনমনে আবারও উচ্ছেদ আতঙ্ক ও বহিরাগত অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলত প্রধানমন্ত্রীর সফরে পার্বত্যবাসী যারপরনাই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অব্যাহত গড়িমসি আর অন্যদিকে সমঅধিকার আন্দোলন-ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী অপতৎপরতা দৃশ্যত ভিন্নতর ও বিচ্ছিন্ন মনে হলেও বস্তুত এসব কর্মকাণ্ড একসূত্রে গ্রথিত। এসব কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করা। তাই আসুন, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসকারী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ:

- পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্যবাসীকে আস্থায় নিতে পারেননি – মঙ্গল কুমার চাকমা ০৩
- গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী ও আদিবাসী জুম্মদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন– রনজিত দেওয়ান ০৭
- বন আইন সংশোধনের উদ্যোগ এবং বন-নির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার – শক্তিপদ ত্রিপুরা ১০
- পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি : উত্তরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই – সমীচিন চাকমা ১৪
- বৈসাবি : বাঙালির এক 'খিচুড়ি' প্রত্যয় – রাহমান নাসির উদ্দিন ১৬

বিশেষ প্রতিবেদন:

- রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : সরকারের মরিয়া উদ্যোগ, এলাকাবাসীর আপত্তি ও বিদ্যমান বাস্তবতা ১৮
- সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইনের একতরফা ও বিতর্কিত উদ্যোগ ২১
- ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে গণ-অপহরণ: ইউপিডিএফের উদ্ভট ২২
- পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত ২৫
- নীরবে চলছে শিশু পাচার ও ধর্মান্তরিতকরণ : সম্প্রতি ঢাকার মাদ্রাসা থেকে আরও ১৬ আদিবাসী জুম্ম শিশু উদ্ধার ২৮
- গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মেলন ২০১৩ অনুষ্ঠিত ৩০
- উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু, সংক্রান..... ৩২

সংবাদ:

- জুম্ম নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও হত্যা ৩৪
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল ৩৮
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন... ৪০
- ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা ৪১
- সংগঠন সংবাদ: ৪৯

প্রবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্যবাসীকে আস্থায় নিতে পারেননি

॥ মঙ্গল কুমার চাকমা ॥

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতি সম্প্রতি পর পর দু'বার পার্বত্য চট্টগ্রামে সফর করেছেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তিনি রাঙ্গামাটির সাজেক ও বান্দরবানের কেওক্রাডং পাহাড় সফর করে রাঙ্গামাটি শহরে জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজিত জনসভায় যোগদান করেন। এর আগে ১৭ নভেম্বর ২০১২ বান্দরবান সফর করেন এবং জেলা আওয়ামী লীগের একটি জনসভায় যোগদান করেন। বর্তমান সরকারের মেয়াদের শেষ সময়ে এসে উক্ত সফরে প্রধানমন্ত্রী হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্যাঞ্চলের বিদ্যমান জলন্ত ইস্যুতে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করবেন এমনটা আশা করেছিল পার্বত্যবাসী। কিন্তু উক্ত দু'টো জনসভায় বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কোন নতুনত্ব ছিল না। ছিল না পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও সমস্যার প্রতি কোন দিকনির্দেশনা। ফলে স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে হতাশ ও অসন্তুষ্ট হয়েছে।

> "রাঙামাটি জনসভায় 'আমরা জনগণের অধিকারে বিশ্বাস করি' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে সেই বাস্তবতারই প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হলেও কিন্তু বাস্তবে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে এ সরকার এগিয়ে আসেনি।"

দু'টি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে প্রধানত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ধর্ম নিয়ে কটুক্তি ও উসকানি বরদাস্ত না করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরা, বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ-রাস্তাঘাট-ব্রিজ স্থাপন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, হেডম্যান ভাতা বৃদ্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, সংসদ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের জন্য ভোট চাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ইস্যুগুলোর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য প্রদান করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি তথা পার্বত্য ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সতর্ক ও দায়সাড়া ভাব।

বান্দরবানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী কোন উস্কানি না শুনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার এক আহ্বান জানান। কিন্তু কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল দিকনির্দেশনাহীন। খোদ এই সরকারের আমলে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ বাঘাইহাটে ও ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ লংগদু রাঙীপাড়ায়, ১৭ এপ্রিল ২০১১ রামগড়-মানিকছড়িতে, ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ বাঘাইছড়ি-দীঘিনালায় এবং সর্বশেষ ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙামাটিতে যে একের পর এক সাম্প্রদায়িক সহিংস হামলা সংঘটিত হয়েছে জুম্ম জনগণ তার কোন সুবিচার পায়নি। এসব হামলায় শত শত জুম্ম ঘরবাড়ি ভস্মিভূত করা হয়েছে; অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছে; আহত হয়েছে শতাধিক ব্যক্তি। সর্বশেষ রাঙামাটিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে জুম্মদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে হামলা সংঘটিত হলেও হামলাকারী কোন বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এসব কোন ঘটনার কথাই আসেনি। একটা সম্প্রদায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে এভাবে অপরাধের দায়মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি না পেয়ে আরো বেশি অবনতি হবে; হামলাকারী কায়েমী স্বার্থবাদীরা সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রদানে ও সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটনে আরো বেশি উৎসাহিত হবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিশেষ পদক্ষেপ না নিয়ে কেবল সভা-সমিতি-বক্তৃতায় সাধারণ আহ্বানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কতটুকু বজায় থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় গতানুগতিকভাবে তিন পার্বত্য জেলায় উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন যা শুনতে শুনতে পার্বত্যবাসীর কান ভারী হয়ে গেছে। বক্তৃতায় তিনি একটি খামার একটি প্রকল্প ও আশ্রায়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হবে বলে উল্লেখ করেন। বলাবাহুল্য, আশ্রায়ন প্রকল্পের প্রতি বস্তুত জুম্ম জনগণের কোন আগ্রহই নেই এবং এ প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্মদের আর্থ-সামাজিক জীবনধারার প্রতি ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা না করে সরকার সারাদেশের ন্যায়

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়নের গতানুগতিক ফিরিস্তি তুলে ধরে তিনি 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতলের চেয়ে পার্বত্য এলাকাকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি' বলে উল্লেখ করেন (দৈনিক পূর্বকোণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩), যদিও সরকারী পরিসংখ্যানে তার উল্টো চিত্রই পাওয়া যায়। যেমন- ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ যেখানে সারাদেশে ১,৯৯৬.৯৮ টাকা সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ১৬৫২.৬৭ টাকা মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.০% এর মতো হলেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ পরিমাণ মাত্র ০.৩২%। এছাড়া বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় সরকারের আমলে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য মোট এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১১৯ কোটি টাকা। এমনকি ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ১০৭ কোটি টাকা। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এডিপি বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৯০ কোটি টাকা। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্যাঞ্চলকে গুরুত্ব দেয়ার' দাবিটি কেবল বাগাড়ম্বর বৈ কিছু ছিল না।

জনগণের উন্নয়ন অধিকারের অন্যতম ভিত্তি হলো সেই জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিশ্চিত করা; এর অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। রাঙামাটি জনসভায় 'আমরা জনগণের অধিকারে বিশ্বাস করি' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে সেই বাস্তবতারই প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হলেও কিন্তু বাস্তবে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে এ সরকার এগিয়ে আসেনি। চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট বিষয়/ক্ষমতা হস্তান্তর না করে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে এসব পরিষদকে অথর্ব অবস্থায় রাখা রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা আজ ১৫ বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উন্নয়নের ফিরিস্তি আওড়িয়ে গেলেও উন্নয়ন অধিকারের মূল ভিত্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে তেমন কিছুই উল্লেখ করেননি। বলাবাহুল্য, শাসনতান্ত্রিক বিশেষ অধিকার থেকে এ অঞ্চলের জনগণকে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত রেখে চলেছে।

রাঙ্গামাটি সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী সার্কিট হাউজে বোতাম টিপে একযোগে নয়টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন বা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হলো রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। পাহাড়িদের উচ্চশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার উদ্যোগ বলে সরকারের তরফ থেকে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু পার্বত্যবাসীর বক্তব্য হলো, পার্বত্যবাসীর উচ্চ শিক্ষা প্রসারে সরকার যদি এতই আন্তরিক হয়, তাহলে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে অধিকতর অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা, দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর কোটা সংরক্ষণ করার মাধ্যমে জুম্মদের উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। বেসরকারী কলেজসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের ভিত্তিব্যবস্থা করতে পারে। বলাবাহুল্য, তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে যে কতিপয় বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে সেগুলো শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সরকার জনমতের বিপরীতে তথা জুম্মদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনা না করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি হতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের এখনো সেই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ভিত্তি গড়ে উঠেনি যা একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের ভয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এলাকার অধিবাসীরা তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে আরো উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে। এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং এতে করে জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখল হয়ে যাবে। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প জুম্মদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের পরিবর্তে ষাট দশকের কাপ্তাই বাঁধ, আশি দশকের সমতল অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা স্থানান্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পের মতো জুম্মদের জীবনধারা ও জাতীয় অস্তিত্বের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। অপরদিকে মেডিকেল কলেজ স্থাপন না করে একটি প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছে পার্বত্যবাসী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গেও পূর্বের মতো আশার বাণী শুনিয়ে বান্দরবান জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 'শান্তিচুক্তির যে সকল বিষয় এখনো বাস্তবায়ন হয়নি তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে' (ইত্তেফাক, ১৮ নভেম্বর ২০১২)। এ প্রসঙ্গে তিনি সংসদ উপনেতার নেতৃত্বে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন গঠন ইত্যাদি পূর্বের বুলি গতানুগতিকভাবে আওড়িয়েছেন। অপরদিকে রাঙ্গামাটির জনসভায় '২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কাজ বন্ধ করে দেয়; আমরা ২০০৮ সালে আবার ক্ষমতায় আসার পর চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি' (দৈনিক পূর্বকোণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) বলে বিএনপির উপর দোষ চাপিয়ে তাঁর সরকারের বিগত চার বছরে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তা তিনি ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা চালান।

উদাহরণ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন

আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই তাঁর সরকারের আমলে চুক্তি বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে উক্ত আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন স্তরে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এখনো ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো প্রথমে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রয়েছে। একপর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে মন্ত্রী সভা ও জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পাঠানো হলে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায়ও উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন সংশোধনের কথা বাদ এখনো পর্যন্ত উক্ত সভার কার্যবিবরণীও লেখা হয়নি। এছাড়া প্রত্যেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সভার পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে। কিন্তু এখনো উক্ত আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনার্থে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়নি। আরো জানা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে ইতিমধ্যে উপরোক্ত ঐক্যমত হওয়া সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে যা নিঃসন্দেহে আরেকটি নতুন জটিলতা সৃষ্টি করবে। বর্তমানে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে বলে বলা যেতে পারে। এই হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা। একটা আইন সংশোধন করতে চার বছর ধরে আলোচনার পরও যদি সংশোধন করা সম্ভব না হয় তাহলে এ থেকে বুঝা যায় বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কতটা আন্তরিক।

দু'টি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী অনেক বিষয়ে বক্তব্য দিলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্যাঞ্চলের অনেক জরুরি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য আসেনি। যেমন– পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলো, বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকরকরণ, দু' দশক ধরে ঝুলিয়ে থাকা এসব পরিষদের নির্বাচন, সেনা কর্তৃত্ব 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, জুম্ম আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, বন, ভূমি, পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা, স্থানীয় পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে কোন দিকনির্দেশনাই ছিল না। বিশেষ করে বান্দরবান জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক বাতিলকৃত ইজারা পুনর্বহাল; বিভিন্ন কোম্পানী, ভূমিখেকো সামরিক-বেসামরিক আমলা ও মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক হাজার হাজার একর জায়গা-জমি জবরদখল; সামরিক উদ্দেশ্যে শত শত একর জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো জলন্ত ইস্যু হয়ে বিরাজ করছে। এসবের কারণে বান্দরবান জেলার পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। মোট কথা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। মুখ্যত বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ- রাস্তাঘাট-ব্রিজ-পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে সস্তা জনমত অর্জনের ব্যর্থ প্রয়াস চালান যা পার্বত্যবাসীকে হতাশ করেছে। স্বভাবতই পার্বত্যবাসী, বিশেষ করে জুম্ম জনগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের ফলে কোন আশার আলো সঞ্চার করতে পারেনি।

বান্দরবানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যে, 'প্রত্যেক ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছি' (ইত্তেফাক, ১৮ নভেম্বর ২০১২)। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে পরিহাস করেছেন বলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে জুম্ম জনগণসহ ভিন্ন ভাষাভাষি ও ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসী জাতিসমূহকেও 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করা হয়েছে। অপরদিকে আদিবাসী জাতিসমূহের 'আদিবাসী' হিসেবে যথাযথ পরিচিতির দাবিকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে সংবিধানে তাদেরকে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পূর্বের মতো সংবিধানে আদিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারগুলো অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বোপরি ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিধানাবলীর বিলোপ করতঃ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহালের সুপ্রীম কোর্টের রায়কে অস্বীকার করে সামরিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' এবং 'বিসমিল্লাহির-রাহমানির-রহিম' সম্বলিত ধর্মাশ্রয়ী বিধানাবলী আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ আপামর পার্বত্যবাসী ও দেশের গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক নাগরিক সমাজের দাবি সত্ত্বেও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোর আইনী হেফাজত প্রদানের লক্ষ্যে সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

রাঙামাটি সফরের সময় প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি অন্যতম কাজ ছিল সাজেক এলাকায় সেনাবাহিনীর কাজ পরিদর্শন ও বান্দরবানের কেওক্রডং-এ ১৮তম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক নির্মিত পর্যটন কেন্দ্র উদ্বোধন। সাজেকে সেনাবাহিনীর কাজ পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আরেকবার পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বকে বৈধতা দিয়ে গেলেন যা ২০০১ সালে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব

প্রধানমন্ত্রী আরেকবার পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বকে বৈধতা দিয়ে গেলেন যা ২০০১ সালে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব 'অপারেশন উত্তরণ' এর মাধ্যমে অর্পিত হয়েছিল। আর বর্তমান বিশ্বে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেখানে ইকো-ট্যুরিজম বা কমিউনিটি ট্যুরিজম উন্নয়নে উৎসাহিত করা হচ্ছে সেখানে স্থানীয় আদিবাসী জুম্মদের কমিউনিটি অধিকার হরণ করে বান্দরবানে সেনাবাহিনী পরিচালিত ট্যুরিজম সেন্টার উদ্বোধন করে গেলেন। এর ফলে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, স্থানীয় অধিবাসীর (কমিউনিটির) স্বার্থ, সর্বোপরি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্থানীয় পর্যটন বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়। কিন্তু সেটা বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর না করে এভাবে চুক্তি বিরোধী প্রকল্প বা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক ট্যুরিজমের নামেও শত শত একর জুম ভূমি জবরদখলের ফলে জুম্ম

অধিবাসীরা নিজ বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্যাঞ্চলের মৌলিক সমস্যার প্রতি দিকনির্দেশনামূলক কোন বক্তব্য দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও পার্বত্যবাসীর আবার ভোট চাইতে প্রধানমন্ত্রী ভুলেননি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করায় পার্বত্য এলাকার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আগামী নির্বাচনেও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, 'নৌকাই অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেবে। আপনারা নৌকাকে আগামীতেও ভুলবেন না' (প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)। সরকার তার নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বিগত চার বছরে চুক্তি বাস্তবায়নের কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কার্যে ও বাস্তবিক অর্থে কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন যদি না থাকে তাহলে পার্বত্যবাসী কোন দুঃখে প্রধানমন্ত্রীর বুলিতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে? স্বভাবতই পার্বত্যবাসী প্রধানমন্ত্রীর সফরে কোন আশার আলো খুঁজে পায়নি। বরঞ্চ পার্বত্যবাসীকে আরো হতাশাগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যার প্রতি বর্তমান সরকারের কোন মনোযোগ ও সদিচ্ছা যে নেই সেটাই পার্বত্যবাসী আরেকবার সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছে।

তারিখ: ২৯ মার্চ ২০১৩

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : সরকারের মরিয়া

(২০ পৃষ্ঠার পর)

- এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলত পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনো স্থিতিশীল নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। এমতাবস্থায় এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে আরেকটি সংকট তৈরি হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি বলে পার্বত্যবাসী মনে করে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বহিরাগত বাঙালিদের অভিবাসন ঘটলে সেটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উক্ত বিধানকে খর্ব করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি 'ঘ' খন্ডের ১০নং ধারায় চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান রয়েছে। তারই আলোকে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে-

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন স্থগিত রাখা।

(খ) তিন পার্বত্য জেলার সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষকদের আবাসন ও পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

(গ) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান কলেজে অধিকসংখ্যক বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালুকরণসহ শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা।

(ঘ) দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজগুলোতে আদিবাসী জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর কোটা সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণাসহ উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা।

(ঙ) তিন পার্বত্য জেলার সদরে প্যারা-মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।

গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী ও আদিবাসী জুম্মদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন

॥ রনজিত দেওয়ান ॥

১৯৫৮ সাল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ পূর্বাংশে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩ ভাষাভাষি শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর অনুন্নত আদিবাসী জুম্ম জনগণকে আধুনিক শিক্ষায়, রাজনৈতিক ও সমাজ সচেতনতায় জাগিয়ে তুলে বিশ্ব সভায় মর্যাদা ও স্থান লাভের মহান লক্ষ্য নিয়ে জন্ম লাভ করে ট্রাইবাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (উপজাতীয় ছাত্র সমিতি)। এর পুরোধা ছিলেন জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বপ্নদ্রষ্টা অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং আরো অনেক প্রগতিশীল ছাত্র নেতা-কর্মী। এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল ঢাকায়। পরবর্তীতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে এর কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬২ সালে ১৩ নভেম্বর ট্রাইবাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের বদলে এর নতুন নামকরণ করা হয় পাহাড়ি ছাত্র সমিতি (হিল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন)। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে বাস্তবতার প্রয়োজনে এবং সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিয়ে আসা হয়। রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হলেও কয়েক বছর এর কার্যক্রম খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে পুনরায় পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। তারপর থেকে এর কার্যক্রম পুরোপুরি পরিলক্ষিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনের মহাকর্মযজ্ঞ যেমন শুরু হয় তেমনি চির অবহেলিত বঞ্চিত পশ্চাদপদ পার্বত্যবাসীর স্বায়ত্তশাসন অধিকার আদায়ের দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র সমিতি জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। ১৯৭২ সালে মার্চ-এপ্রিলে চেঙ্গী, মাইনী, মারিশ্যা ভ্যালি এবং বান্দরবানে ছাত্র প্রতিনিধিদল সাংগঠনিক সফর করে। তখন আমরা ছয়জন প্রতিনিধি চেঙ্গী, মাইনী সফর করি। এতে আমি নিজে বাদে আরও ছিলেন প্রয়াত চাবাই মগ (তখন তিনি সভাপতি ছিলেন), শ্রী উষাতন তালুকদার, শ্রী প্রমোদেন্দু চাকমা, শ্রী সুভাষ চাকমা (বর্তমানে কানাডায় আছেন) ও জিতেন্দ্রীয় চাকমা গুংগু। ১৯৭২ সালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটিতে চাবাই মগ সভাপতি হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন দীপংকর চাকমা ধামাই। আর আমি দায়িত্ব পাই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদকের পদ। ঐ বছরই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল রাঙ্গামাটি সফরে এলে সার্কিট হাউসে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে। ঐ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে আমিও ছিলাম।

এভাবে বিভিন্ন সময় পাহাড়ী ছাত্র সমিতি শুধুমাত্র জুম্ম ছাত্র সমাজ ও জাতিকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করেনি নিজস্ব ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতিকে তুলে ধরে বিকাশ ও প্রকাশ সাধনের ক্ষেত্রেও অনন্য ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়। একের পর এক সৃষ্টি হতে থাকে দেশাত্ববোধক গান, গণসঙ্গীত, আধুনিক চাকমা গান। ঐতিহ্যবাহী জুম নৃত্য, বিজু নৃত্য ঘুমপাড়ানি গানের উপর নৃত্য। বিজু নৃত্যের ধারণাটি অবশ্য আমারই ছিল। ঝর্ণা চাকমা ও আমি দু'জনে মিলে সৃষ্টি করি আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিজুর উপর নৃত্যটি। ১৯৭২ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির মাধ্যমে ঢাকায় বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি এবং প্রচুর সাড়া জাগে ঢাকাবাসীদের মধ্যে।

এক সময় আমাদের সবার মনে একটা ভাবনা উদয় হয় যে, কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগের অধীনে একটি শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্টি করা যার লক্ষ্য হবে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির পতাকা তলে আদিবাসী সংস্কৃতি কর্মীদের সংগঠিত করা। এই ভাবনা থেকে ১৯৭৩ সালে জন্মলাভ করে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী। নামকরণ করেন প্রয়াত মিসেস প্রতিমা চাকমা, যিনি হুক্কি মা হিসেবে একনামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের পরিবারটি পুরোপুরি ছিল সংস্কৃতিমনা। তখন আমি ছিলাম সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক। গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী শুধু রাঙ্গামাটিতে নয় দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন: কাউখালি, কাপ্তাই, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে, কক্সবাজারে, ঢাকায়, ঠাকুরগাঁওতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে অনেক সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করে। মনে আছে ১৯৭৩ সালে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহিলা সাংসদ শ্রীমতি সুদিপ্তা দেওয়ানের নেতৃত্বে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী ঢাকায় অনুষ্ঠান করে। এক পর্যায়ে বঙ্গভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ৩০ মিনিটের বিভিন্ন আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করা হয়। ঐ সময় বঙ্গবন্ধুর হাতে বুড্ডিস্ট স্টাইপেন্ড প্রদানের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন গৌতম কুমার চাকমা (বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য)। তখন শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন ইউসুফ আলি। গৌতম চাকমা তখন পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আর আমি ছিলাম সিনিয়র সহ-সভাপতি।

এটা ছিল ১৯৭৩-৭৪ সালের মেয়াদকাল। রাঙ্গামাটিতে সর্বপ্রথম গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী জন্মলাভ করে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির পতাকা তলে। গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর 'সাধোন খুমবার' এবং মনোজ বাহাদুর গোর্খার নেতৃত্বে 'সূর্যশিখা' শিল্পীগোষ্ঠীর জন্ম হয়। তখনকার সময় নৃত্যের ক্ষেত্রে ঝর্ণা চাকমার নাম ছিল সবার উপরে। তাঁর অনেক নৃত্য সৃষ্টির মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাচ ছিল 'উত্তোন পেগে মেঘে মেঘে' গানটির উপর অনবদ্য এক সৃষ্টি। এই নৃত্যটি প্রথম পরিবেশিত হয় ১৯৭৩ সালে ১৩ নভেম্বর পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে। ১৯৭৩ সালে অক্টোবরের শেষের দিকে সাংগঠনিক কাজে যেতে হয়েছিল মারিশ্যায়। একদিন দুপুর বেলায় জীবঙ্গছড়ার (বর্তমান বাবুপাড়া)

এক বাড়িতে মিটিং শেষে মারিশ্যার বর্তমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমর শান্তি চাকমা পকেট থেকে একটা গান বের করে বিনম্রভাবে বললেন, কথা ও সুর দেখে দিতে। গানটির কথা দেখে ও সুর শুনে আমিতো অবাক! গায়ে শিহরণের ঢেউ খেলে গেল। এত সুন্দর ছন্দবদ্ধ গভীর অর্থপূর্ণ কথা আর সুর। একটি মাত্র শব্দ 'এগালা' এর পরিবর্তে 'এগা মনে' বসিয়ে দিতে হল। সুরটা অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়েছিল। সে গানটি তাৎক্ষণিক সুর ঠিক করে গলায় তুলে রাঙ্গামাটি নিয়ে আসি এবং ১৩ নভেম্বর নাচ ও গান একসাথে পরিবেশিত হয়। পরে এই গানটি জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে যায় এবং খ্যাতি লাভ করে। এমন কথার মাধুর্য্য আর গভীরতায় ভরা গান মনে হয় আমরা কেউ সৃষ্টি করতে পারিনি। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, পাহাড়ি ছাত্র সমিতির পতাকা তলে একমাত্র গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীই পার্বত্য চট্টলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জোয়ার সৃষ্টি করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় আত্মপরিচয়ের দুয়ার উন্মোচন করে। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সাহানা দেওয়ান, নিরূপা দেওয়ান, স্নেহময় চাকমা, মিন্টুনী উল্লেখযোগ্য। নৃত্য শিল্পী ছিলেন ঝর্ণা চাকমা (ধক্কবী), অর্পিতা দেওয়ান, শাশ্বতী দেওয়ান, বিপাশা দেওয়ান, টিঙ্কু তালুকদার, এনাক্ষী খীসা, সুবর্ণা চাকমা, আলোকপ্রিয় চাকমা, স্মৃতিমোহন চাকমা, মোহন মারমা, বিশ্বকীর্তি ত্রিপুরা, মুকুল মারমা (বর্তমানে আমেরিকায়), বিনয় চাকমা, স্মৃতি প্রকাশ চাকমা, সাগরিকা রোয়াজা এবং আরো অনেকে। গীতিকার হিসেবে সুগত চাকমা ননাধন পরিচিতি লাভ করেন একমাত্র গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে। পাহাড়ি ছাত্র সমিতি না হলে রনজিৎ দেওয়ানের ব্যাপক পরিচিতি লাভ করা সম্ভব হতো কিনা শতভাগ প্রশ্ন থেকে যায়।

পাহাড়ি ছাত্র সমিতির গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা শুধুমাত্র নতুন গান-নৃত্য সৃষ্টি করেনি, পোষাকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ও আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। নারী শিল্পীরা পিনন-খাদি পরে যখন নৃত্য গীত পরিবেশন করত তখন অপূর্ব এক পরিবেশ ও আবেগের সৃষ্টি হতো। অনেক মা-বোন তখন ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী পোষাক পরা শুরু করল। আমাদের সমাজে আজ পিনন-খাদি ও বয়নশিল্প অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এখনো স্পষ্ট মনে আছে যে, ঐ সময় আমার মা আমাকে কোমর তাঁতে সুন্দর একটা গামছা বুনে দিয়েছিলেন। জাতীয় চেতনায় এত উদ্বেলিত ছিলাম যে, ঐ গামছা পরে ছোট্ট রাঙ্গামাটি শহরটা ঘুরে বেড়াতাম। শুধু তাই নয়, ১৯৭২ সালে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের (শিখ, ডোগরা, তিব্বতী, ভুটিয়া) সম্মানে প্রশাসনের উদ্যোগে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঐ গামছাটি পরে আমার লেখা ও সুর করা তৃতীয় চাকমা গানটি 'মুর' বন্দার পুঅ এক মুই' গেয়েছিলাম। এর দেখাদেখি লক্ষ্মী প্রসাদ, বিনয় এবং আরো বেশ কিছু ছেলে তখন কোমর তাঁতে বোনা গামছা পরত। তখনকার সময়ে শিল্পীরা ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং প্রাণচাঞ্চল্যে হাসিখুশিতে ভরপুর। বলা যায়, নব সৃষ্টির আনন্দে উল্লসিত যা বর্তমান সময়ের শিল্পীদের মধ্যে বড় অভাব দেখা যায়।

গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর জন্মের পর ইতিমধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গেলো। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হলো। বাকশাল সৃষ্টি হলো। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। চির অবহেলিত বঞ্চিত পার্বত্য আদিবাসী জুম্ম জনগণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হলে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে দিতে বাধ্য হলো। এক অনিশ্চিত টালমাতাল পরিস্থিতির উদ্ভব হল। এই পরিবেশে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্ট সংস্কৃতির জোয়ারও স্বদেশে স্তব্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী অন্য আঙ্গিকে তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে।

আজ বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসমূহের সাথে আমাদের জুম্ম জাতিসমূহেরও পরিবর্তন হয়েছে মানসিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির। গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীও এর ব্যতিক্রম নয় বলে মনে করি। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মনে ধারণ করে একে আরো গতিশীল ও সক্রিয় করতে হবে বলিষ্ঠ কর্মউদ্যোগের মাধ্যমে। তা না হলে এক সময় 'এক যে ছিল রাজা'-এর মত গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী অতীত ইতিহাস হয়ে থাকবে।

আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতির অস্থির পরিবেশ, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া, সর্বোপরি আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমুখীনতার কারণেই আজ শুধু গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী নয়, কোন আদিবাসী সংগঠনেই নতুন প্রজন্ম সেভাবে এগিয়ে আসছে না। নিজের সৃষ্টিশীল মেধা ও প্রতিভাকে বিকশিত করে আমাদের আদিবাসী জুম্ম জাতির সাহিত্য-সংগীত, নৃত্যকলা, চারুকলা শিল্পকে সুরক্ষা, উন্নয়ন, প্রকাশ ও প্রচার, সংরক্ষণের জন্য আমাদেরকেই যত্নবান হতে হবে। রাষ্ট্র বা কোন সরকার তা করে দেবে না। নিজের যোগ্যতা-দক্ষতা-বিচক্ষণতার বলেই বিশ্বসভায় নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরতে হবে। এর জন্য বড়বেশী প্রয়োজন আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-উপলব্ধি এবং আত্ম-চেতনার জাগরণ। বাংলাদেশে যত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে তার মধ্যে চাকমারা অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষার হার ৭৮% শতাংশেরও বেশি। তাই দায়বোধও আমাদের বেশি। অবশ্য এটাও সত্য যে, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে বড় ভাই আন্তরিকভাবে সামনে এগিয়ে এলেও, অভিন্ন অধিকার আদায় ও স্বার্থপূরণের জন্য ছোট ভাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেও, যদি ছোট ভাই নিজের চাওয়া পাওয়াকে সম্যকভাবে বুঝতে না পেরে বড় ভাই এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে না চায় তাহলে বড় ভাই-এর কিছু করার থাকে কি?

এখানে আমার কথা হচ্ছে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যথার্থ নয়, অফিস আদালত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পিয়ন দারোয়ান থেকে শুরু করে ডাক্তার-প্রকৌশলীসহ বড় আমলা হওয়া বড় কথা নয়, নিজের ঐতিহ্য-সমাজ সংস্কৃতিকে আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে ধারণ, লালন-পালনের মাধ্যমে আমাদের মূল শেকড়কে অবলম্বন করে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে নিজের পরিচয় ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তা না হলে অনাগত কালের বিবর্তনে আমাদের পরিচয় হবে ছোট চোখ, খাড়া চুল, বোঁচা নাক, চেপ্টা মুখের গড়ন 'নাপ্পি' পোড়া মরিচ দিয়ে 'কোরবুঅ' আর চোঙায় 'গুতাইয়া' খাওয়া এক মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী। তাই আদিবাসী নতুন প্রজন্মের কাছে আমার

বিনীত প্রশ্ন, আমরা কোনটা চাইবো? আত্ম-অচেতন হয়ে কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপূরণের প্রয়াসে কচুরিপানার মত জীবন আছে ভিত্তি নেই, শেকড় আছে মাটি নেই, বিস্তার আছে স্থায়ীত্ব নেই, সৌন্দর্য্য আছে নেই মনোমুগ্ধকর গন্ধ মাধুর্য্য- এই অবস্থায় পতিত হবো? এই পথ দিয়ে কি আমরা আমাদের ঠিকানা নির্ধারণ করবো নাকি হৃদয় ভূমিতে চেতনার বীজ বুনে ফুলে ফসলে ঐতিহ্যমন্ডিত হয়ে জগৎসভায় নিজেদের আসন পেতে নেবো? হে নতুন প্রজন্ম, আত্মস্থ হয়ে একবার ভাববেন কি? এখনো সময় আছে চর্তুদিক প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়ার। প্রয়োজন আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মউপলব্ধি এবং চেতনার বন্ধ-দুয়ার খুলে কর্মোদ্যমী হওয়া, অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। নিজের আত্মপরিচয়কে উর্ধ্বে তুলে ধরা। তা না হলে জাতিগতভাবে সেই বিখ্যাত বাংলা আধ্যাত্মিক গানটির মত বলতে হবে– 'আইলাম আর গেলাম, পাইলাম আর খাইলাম, ভবে দেখলাম শুনলাম, কিছুই বুঝলাম না।' এটাই কি হবে আমাদের ভবিষৎ পরিণতি?

বি:দ্র: নিবন্ধটি গত ৫ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মেলনে পঠিত।

ঐতিহ্যবাহী বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক...

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

সচেতন মহলের সতর্কতা প্রয়োজন। কেননা সরকার ১৯৯৬ সালে জুম্ম জনগণের এই জাতীয় সামাজিক উৎসবকে সরকারীভাবে বিজু নামে ঘোষণা দিয়েছে।

উৎসব উপলক্ষে ইউপিডিএফের বোনাস চাঁদাবাজি : জন্মলগ্ন থেকে সারা বছরব্যাপী ইউপিডিএফ নিয়মিতভাবে চাঁদাবাজি করে থাকে। জোর করে, হুমকি-ধামকি দিয়ে, চিঠি দিয়ে, নানা ছদ্মবেশ ধরে তারা জনগণের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করে থাকে। আর এই চাঁদার জন্য তারা গ্রামবাসীকে কখনো কখনো ঘরছাড়া করে, আবার কাউকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে এই চাঁদা উসুল করে বা মুক্তিপণ আদায় করে। নিয়মিত ছাড়াও যে কোন সময় যে কোন অজুহাতে বা ইস্যুতে তারা জনগণের উপর চাঁদার ভার চাপিয়ে দিতে পারে। সম্প্রতি বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু, সংক্রান্তি উৎসবকেও এই চুক্তি বিরোধীরা চাঁদাবাজির এক উপলক্ষ বা ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে। এই উৎসব উপলক্ষে চাকুরীজীবিরা যে বেতনের অতিরিক্ত বোনাস পেয়ে থাকে এবং যারা চাকুরীজীবি নয় তারাও উৎসব পালনের লক্ষে সামর্থ অনুযায়ী টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করে সেই বোনাস বা জমানো অর্থই ইউপিডিএফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এজন্য তারা চাকুরীজীবি ও অন্যান্য পেশাজীবিদের উদ্দেশ্যে চিঠি দিয়ে নির্ধারিত হারে চাঁদা দাবি করে বসে। ইউপিডিএফ এর খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক পুলক চাকমা ও অর্থ চীফ অলিন স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে চাঁদার হার ধরা হয়– (১) প্রথম শ্রেণীর চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে মাসিক মূল বেতনের ৩% টাকা হারে ১ বছরের অর্থ; (২) ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরীজীবি হলে মাসিক মূল বেতনের ২% টাকা হারে ১ বছরের অর্থ; (৩) যারা চাকুরীজীবি নয় এমন প্রত্যেক পরিবারের ক্ষেত্রে বাৎসরিক হার কমপক্ষে ৩০০ হতে ৫০০ টাকা।

গরিয়া নাচের উপর ইউপিডিএফের নিষেধাজ্ঞা : পঞ্চসেন ত্রিপুরা ও সুজিত ত্রিপুরা নামে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা মাটিরাঙ্গা উপজেলায় বৈসু উৎসবের সময় গরিয়া নৃত্য পরিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। শুধু গরিয়া নৃত্য নয়, ধর্মীয় কীর্তনও আয়োজন করা যাবে না বলে এলাকায় নির্দেশ জারী করে। ইউপিডিএফের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এলাকাবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে গরিয়া নৃত্য ও ধর্মীয় কীর্তন আয়োজন করে বলে জানা যায়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৬২ জন সদস্য অপহরণ

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

৩৭. ইন্দ্রজয় চাকমা, পিতা প্রভাত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম চুরাখালী দজর
৩৮. বীরবাহু চাকমা (৩৩), পিতা ফুলেশ্বর চাকমা, গ্রাম বড় মাইল্যা
৩৯. নীলচন্দ্র চাকমা (৩৫), পিতা মৃত রঞ্জন্যা চাকমা, গ্রাম পেরাছড়া এলাকাবাসী
৪০. বুদ্ধাঙ্কুর চাকমা (৩৭), পিতা সাধন কুমার চাকমা, গ্রাম তালুকদার পাড়া. বাঘাইছড়ি থানা
৪১. রাধিকা মনি চাকমা (৪৫), পিতা মৃত লক্ষ্মীধন চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি
৪২. দয়াল বিন্দু কার্বারী (৪৭), পিতা সতীশ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম উত্তর সার্বোয়াতলী
৪৩. খোকন চাকমা (৩৮), পিতা উৎপল কান্তি চাকমা, গ্রাম কদমতুলি, বাঘাইছড়ি থানা
৪৪. পলক তালুকদার (৪১), পিতা ললিত বরণ তালুকদার, গ্রাম বাবুপাড়া
৪৫. ললিত রঞ্জন চাকমা (৪৬), পিতা মৃত রবীন্দ্র কুমার চাকমা, গ্রাম মোষপয্যা
৪৬. ভূমিত্র চাকমা (৪০), পিতা যামিনী কুমার চাকমা, গ্রাম তুলাবান
৪৭. চিরঞ্জীব চাকমা, দীঘিনালা এলাকাবাসী
৪৮. অরুণ চন্দ্র চাকমা (৫৮), পিতা মৃত ভাগ্যচরণ চাকমা, উত্তর সিজক
৪৯. চন্দ্রশেখর তালুকদার (৩৫), পিতা মৃত অশ্বিনী কুমার তালুকদার, দক্ষিণ সার্বোয়াতলী
৫০. বরুণ খীসা (৩৫), পিতা কিরণ কুমার খীসা, গ্রাম তালুকদার পাড়া, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৫১. মধু জীবন চাকমা (২৯), পিতা রিজেব কুমার চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি (টেম্পু চালক)
৫২. সুজন চাকমা (২২), পিতা জীতেন্দ্র চাকমা, গ্রাম দক্ষিণ খাগড়াছড়ি (এসএসসি পরীক্ষার্থী)

বন আইন সংশোধনের উদ্যোগ এবং বন-নির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার

॥ শক্তিপদ ত্রিপুরা ॥

বন, বনের অস্তিত্ব ও আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা, তাদের সংস্কৃতি ওতোপ্রতভাবে জড়িত। বন ধ্বংস হয়ে গেলে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও তাদের সংস্কৃতির উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে। অপরদিকে কোন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আদিবাসীরা প্রান্তিক অবস্থায় নিপতিত হলে সে অঞ্চলের বনও আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যখন বৃটিশের করায়ত্ত হলো তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। বৃটিশ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষ লক্ষ একর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করা হয় এবং সেখানে সেগুনের বাগান গড়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য যে, সেগুন এদেশের দেশজ বৃক্ষ নয়, তা বার্মা থেকে আমদানি করা হয়েছিলো। সেই যে বৃটিশ আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বন ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হলো তা আজও থামেনি। সরকার বন রক্ষা ও বন সৃজনের কথা বললেও কার্যত প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে বনদস্যুরা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের অপরাপর অঞ্চলের বন ও বৃক্ষ সাবাড় করে চলেছে।

> “বন আইন (সংশোধন) ২০১২-এর প্রস্তাবিত আইনে একদিকে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছে অপরদিকে আদিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এমন অনেক মারাত্মক বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে।”

দেশের ‘বন আইন’ বনবান্ধব নয়। ১৯২৭ সালে প্রণীত বন আইন দিয়ে বন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল দেশে এক ‘জন-বন ও পরিবেশবান্ধব বন আইন’ প্রণীত হবে; কিন্তু সেটি হয়নি। দেশ আজ অবধি ‘জন-বন ও পরিবেশবান্ধব বন আইন’ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। একটি স্বাধীন দেশের জন্য তা সত্যিই লজ্জাজনক বটে। স্রেফ মুনাফা লাভ এবং শোষণ প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৯২৭ সালে বন আইন তৈরি করেছিলো। এই আইনে স্বদেশপ্রেম ছিল না, ছিল না কোন দেশীয় স্বার্থ। সে কারণে ১৯২৭ সালের বন আইন দেশের বন রক্ষা করতে পারছে না। পরিবেশগত ভারসাম্য, জলবায়ু সুরক্ষা, বনবাসীদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুগোপযোগী বনবান্ধব বন আইন প্রণয়ন করা দরকার। বন আইন ছাড়াও পরবর্তীতে যে সব বন সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন– আটিয়া বন অধ্যাদেশ-১৯৯৮, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা-২০০০, বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন-২০১০ ইত্যাদিও আদিবাসী ও বনবান্ধব নয়। দেশের এসব আইন বন ও ভূমির উপর আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারকে অস্বীকার করে। এসব আইন প্রাকৃতিক বন সুরক্ষাসহ দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। আইন ও নীতি প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপনিবেশিক মানসিকতার কারণে বাংলাদেশে অদ্যাবধি বন ও পরিবেশবান্ধব বন আইন প্রণীত হতে পারেনি।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯, ১৯৯০ ও ২০০০ সালে ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধন করে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এসব সংশোধিত আইন দিয়ে দেশের বন রক্ষিত হচ্ছে না। কারণ উপনিবেশিক আমলের এই বন আইন বন, বনবাসী ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে প্রণীত হয়নি। বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুন্ন এবং প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে স্রেফ মুনাফার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার পরিবেশ বিরোধী বিদেশী জাতের ‘বৃক্ষ বাগান’ গড়ে তুলেছিলো। বর্তমানেও উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও আইন দিয়ে বাংলাদেশ চলছে। ভারতসহ এশিয়ার বহু দেশ বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ করত দেশের প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো প্রাকৃতিক বন ও বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণমূলক আইন প্রণয়নে সক্ষম হয়নি। ফলে দেখা যায় যে, বন বিভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তারা বন বিভাগের সৃজিত বাগানের গাছ পাচার করে বালিশ ও ট্রাংক ভর্তি টাকা বানাতে সক্ষম হচ্ছে।

দেশের নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে ‘বন অধিকার আইন’ প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার বন সংরক্ষণ সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন না করে আবারও ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে এ আইন সংশোধনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে পেশ করেছে। বন আইন (সংশোধন) ২০১২-এর প্রস্তাবিত আইনে একদিকে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছে অপরদিকে আদিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন অনেক মারাত্মক বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, ‘বন’ বলতে প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, “(1A) ‘Forest’ means any land, which is the property of the Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest-produce to which the Government is entitled and which is declared as forest under this Act and also includes reserved forest, protected forests and other forests.”

'অন্যান্য বন' বলতে বলা হয়েছে– 'The waste-land, char land or forest plantation comprised in any such notification shall be called a 'other forest' [34A(2)].

'অন্যান্য বন'-এ যেসব কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে-

Acts prohibited in other forests- Any person who commits any of the following offences, namely:-

(a) fells, girdles, lops, taps or burns any tree or strips off the bark or leaves from, or otherwise damage the same;

(b) Clears or breakes up any land for cultivation or any other purpose or cultivates or attempts to cultivate any land in any manner;

(c) Set fire to a other forest, or, kindles any fire, or leaves any fire burning, in such manner as to endanger such a forest;

(d) In contravention of any rules made in this behalf by the Government, hunts, shoots, fishes, poisons water or set traps or snares; or

(e) Establishs saw-pits or saw benches or converts trees into timber without lawful authority;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and shall also be liable to fine which may extend to ten thousand taka, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to pay."

প্রস্তাবিত আইনে 'অন্যান্য বন' অংশে বলা হয়েছে– 'অন্যান্য বন' এর কোন গাছের পাতা কিংবা ডাল ছেড়া যাবে না। মাটি খনন করা যাবে না। গাছ বা বন পোড়া যাবে না ইত্যাদি। যারা আইন প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের ভুলে গেলে চলবে না, আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও বন একে অপরের পরিপূরক। আদিবাসীরা জুমচাষ করে জীবন ধারণ করে। এ ধরনের চাষ কেবল বনাঞ্চলেই সম্ভব। এছাড়া আদিবাসীদের প্রতিদিনকার খাদ্যের তালিকায় সাধারণত বনজ শাক-সবজি থাকেই। বনের নানান ধরনের আলু আদিবাসীদের খুব প্রিয়। আদিবাসীরা অসুখ-বিসুখে বনজ ওষুধের উপর নির্ভরশীল। আদিবাসী সমাজে শিশু সন্তান জন্ম হলে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানসহ নানান পূজা পার্বণে বনজ লতাপাতা, ফলমূল হলো অপরিহার্য অনুষঙ্গ। শুধু জন্ম অনুষ্ঠানে নয়, মৃত্যু বা দাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও বনের ফল, লতা, পাতা অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বনের ফল, আলু, শাক-সবজি, লতা-পাতা, শেকড় ইত্যাদি শুধুমাত্র জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কিত তা নয়, এসব আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রথা-রীতির সাথেও সম্পর্কিত। তাই প্রস্তাবিত বন আইনের 'অন্যান্য বন' এর অংশে যেসব শর্তাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে এসব শর্তাবলীসহ আইনটি সংসদে পাশ হলে এ আইন আদিবাসীদের জীবনে মারাত্মক আকারে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ আইনটি অবিকলভাবে পাশ হলে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা অসহনীয় হয়ে উঠবে।

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে গত ১৭ নভেম্বর ২০১২ রাঙামাটি সফরকারী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিভিউ কমিটির কাছে বন আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকদের পক্ষ থেকে মতামত ও সুপারিশমালা তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। উক্ত স্মারকলিপিতে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, প্রস্তাবিত বন আইন সংশোধনী বিলটি যদি বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী অপরিবর্তিতভাবে সংসদে পাশ হয় এবং আইনে পরিণত হয় তবে অত্রাঞ্চলের বনবাসী, আদিবাসী এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠী জনগণের শতাধিক বছর ধরে পরম্পরায় অনুসৃত ও আচরিত প্রথা, রীতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি তথা জীবন ও জীবিকা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। কারণ বাংলাদেশের অপরাপর অংশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, প্রথা, মালিকানার ধরন এবং প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদির প্রকৃতি ও ধরন সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বন আইনের সংশোধনী প্রস্তাব অর্থাৎ সংশোধনকল্পে আনীত প্রস্তাব সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্যে নিম্নে সুপারিশমালা তুলে ধরেন-

১. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ৪ নং ধারায় বনবাসন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে কোনো বন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া যাবে। আমরা মনে করি বনবাসন কর্মকর্তার দায়িত্বটি বিচারিক, প্রশাসনিক নয়। তাই সেখানে কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ না করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগই যৌক্তিক।

২. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ৬ ধারা, ৭ ধারা ও ৮ নং ধারা (মূল বন আইনের ৯ ধারা, ১৬ক/১ এবং ২০/১(ক) উপধারা-তে বিলুপ্তির যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে অর্থাৎ সংরক্ষিত বন ঘোষণার প্রক্রিয়ায় অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিতকরণের যে প্রস্তাব করা হয়েছে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসী, বনবাসী এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠী তাদের প্রথাগত ও প্রচলিত ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদের সহজাত মানবাধিকারের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ৬ নং, ৭ নং ও ৮ নং ধারা প্রত্যাহার করা হোক।

৩. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ১২ নং ও ১৩ নং ধারা মূলে (মূল আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৪ ধারায়) নতুন করে Other Forest হিসেবে ৩৪/এ এবং ৩৪/বি উপধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল আইনে ৩৪ ধারায় কিছু অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে কিন্তু উপধারায় Other Forest : ঘোষিত হলে প্রদত্ত সকল অধিকার বাতিল/রহিত হয়ে যাবে, যা মূল ৩৪ ধারার সাথে বিরোধাত্মক। তাছাড়াও সংরক্ষিত বন ঘোষণার যে সকল প্রক্রিয়া বন আইন অনুসরণে বাধ্যবাধ্যকতা আছে সে সকল প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে সরাসরি সংরক্ষিত বন ঘোষণার উদ্যোগ কোন মতেই গণতান্ত্রিক এবং আইনী শাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না।

সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী যদি ৩৪/এ এবং ৩৪/বি উপধারা সংসদে আইন হিসেবে পাস হয় তবে অত্রাঞ্চলে বা অন্যত্র আদিবাসী, বনবাসী এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরা যে ভূমিতে বসবাস করছে সে ভূমি থেকে উচ্ছেদ হবে, তাদের বাসস্থান, জীবিকা, কৃষ্টি, প্রথা, চাষাবাদ, পানি, গোচারণ ভূমি, চলাচল, পবিত্র ভূমি ও অন্যান্য প্রথাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। আর ফৌজদারী আইনের দ্বারা হয়রানির শিকার হবে। তাই প্রস্তাবিত ৩(গ), ১২ ও ১৩ নং ধারাসমূহ অর্থাৎ Other Forest ঘোষণার ধারা প্রত্যাহার করা হোক।

৪. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ১০ নং (মূল বন আইনের ৩০ধারা) ধারাতে রক্ষিত ঘোষণার সীমারেখা তুলে নেয়ার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা আইনে পরিণত হলে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর জীবিকা, কৃষ্টি, প্রথা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রথাগত অধিকার হরণ করা হবে এবং বনের টেকসই ব্যবহারও হবে না। তাই সেটা বহাল রাখা হোক।

৫. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ১৪ ধারা এবং মূল বন আইনের ৩৮ (সি) এর সাব সেকশন (১) যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে বেসরকারী বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং ইকো-সিস্টেমের ক্ষতিকারক কিছু করা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী ভূমিতে সেক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে হয় এই বিধান প্রত্যাহার করতে হবে অথবা সরকারী কোন ভূমিতেও ঐ সব কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ২১ ধারা এবং মূল বন আইনের ৬৯/বি-এর নতুন সংযোজন উপধারায় (ধ)(৩) বনবিভাগের কোন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা এবং তদ্‌জনিত অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বন বিভাগের কোন কর্মকর্তা যদি তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকেন তবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত/বিচার এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থেকে যাবে।

৭. প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের ২৪ ধারা এবং মূল বন আইনের ৮৪ ধারাতে নতুনভাবে যে ৮৪(ক) ও ৮৪(খ) উপধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা আইনে পরিণত হলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী, বনবাসীদের বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে রাইংক্ষ্যং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ও সিলেটে বসবাসরত খাসি জনগোষ্ঠীর লোকজন (যাদের জীবিকার একমাত্র উপায় হচ্ছে বনাঞ্চলে পানচাষ) তাদের জীবন ও জীবিকা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া ২৪/বি অর্থাৎ ৮৪(খ) এর কারণে পার্বত্যাঞ্চলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে এবং জনগণ হয়রানির শিকার হবে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারী ট্যাক্স আদায় হয় স্থানীয় মৌজা হেডম্যানদের মাধ্যমে যারা তহশীলদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং জমি হস্তান্তর, জরিপ, বিক্রয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে বন বিভাগকে যদি সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হবে এবং জনগণ হয়রানির শিকার হবে। সে কারণে উক্ত দু'টি উপধারা (৮৪/এ এবং ৮৪/বি) প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বন আইনের খসড়া সংশোধনী অপরিবর্তিত অবস্থায় পাশ ও কার্যকর হলে আদিবাসীদের উপর অযথা হয়রানি বৃদ্ধি পাবে। এ আইন আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার ও প্রথা-রীতির উপরও বড় মাপের বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আদিবাসীরা ঐতিহ্যগত আচার ও প্রথার ভিত্তিতে সামাজিক উৎসব কিংবা পূজা-পার্বণ করতে পারবে না। ঐতিহ্যগত আচার ও রীতি অনুসরণ করে উৎসব কিংবা পূজা অর্চনা করতে গেলে বনের সেই ফল ও লতা-পাতার প্রয়োজন হবে। বন থেকে এসব সংগ্রহ করতে গেলে বন বিভাগ বাধ সাধবে। উৎসব কিংবা পূজা-পার্বণের এসব অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করার জন্য হয়তো বন বিভাগের কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হবে, নয়তো আসামী হয়ে জেলে যেতে হবে– এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে আদিবাসীদের।

আইন প্রণেতাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে কেবলমাত্র আদিবাসীরাই তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলে 'বন' সংরক্ষণ করে রেখেছে। যেসব বনাঞ্চলে আদিবাসীরা বসবাস করছে, সেসব বনাঞ্চলে আইন প্রণয়ন করে যদি আদিবাসীদের বিপন্ন করে তোলা হয়, তাহলে স্বাভাবিক কারণে সেসব অঞ্চলের বনও বিপন্ন হবে। অতীত ইতিহাস বলে যে, যেসব অঞ্চলে আদিবাসীরা বিপন্ন হয়ে পড়েছে, সেসব অঞ্চলের বনও বিপন্ন হয়েছে। তাই আইন প্রণেতাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার। বন বাঁচিয়ে রাখার জন্য আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আদিবাসীরা হাজার বছর ধরে কিভাবে বন বাঁচিয়ে রাখে সে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। এ শিক্ষা গ্রহণ করা গেলে বর্তমানে বাংলাদেশে যতটুকু পরিমাণ বন আছে তার সুরক্ষা সম্ভব হবে এবং সে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বনের সম্প্রসারণও সম্ভব হবে।

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর, গারো পাহাড় ইত্যাদি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল শুধু বন আর বন ছিল। এখন সেসব অঞ্চলের আদিবাসী ও বন সমভাবে বিপন্ন। গারো পাহাড়ে বর্তমানে বন নেই বললেই চলে। মধুপুর ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু কিছু এলাকায় বন আছে, যেখানে আদিবাসীরা বসবাস করে। তবে সেসবও শেষ করার জন্য নানা ধরণের ষড়যন্ত্র চলছে। সরকারের মনে রাখা দরকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কখনো সফলভাবে বন সংরক্ষণ করা যায় না।

প্রস্তাবিত বন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এর আলোকে প্রণীত আইনসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে রিজার্ভ ফরেষ্ট ব্যতীত সকল ভূমি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীন। তা'ছাড়া আদিবাসীদের রয়েছে ভূমির উপর প্রথাগত অধিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে স্বীকৃত। সংগত কারণে প্রস্তাবিত বন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু এই প্রস্তাবিত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়নি কিংবা এই বন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন অনুসরণে প্রযোজ্য হবে মর্মে বন আইনে একটি স্বতন্ত্র বিধান রাখা অত্যাবশ্যক। তাই প্রস্তাবিত এ আইন অবিকলভাবে পাশ হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে। সমতলের

আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও এ আইন ক্ষতিকারক হবে।

সরকার এ আইন সংশোধনের প্রশ্নে আঞ্চলিক পরিষদকেও উপেক্ষা করে চলেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন- ১৯৯৮ এর সুস্পষ্ট লংঘন। ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইনের ৫৩ নং ধারায় বলা হয়েছে- সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রভাব পড়ে এরকম কোন আইন প্রণয়ন কিংবা সংশোধন করতে চাইলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সরকার বা সরকারের পক্ষে এতদ সংক্রান্ত কমিটি বা মন্ত্রণালয় আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা কিংবা কোন ধরনের পরামর্শ গ্রহণ করেনি যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সরকারের উচ্চ স্তরের লোকেরা যদি সরকারের প্রণীত আইন লংঘন করে তাহলে আইনের শাসন নিশ্চিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় বন এর উপর আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ:

- বন ও ভূমির উপর আদিবাসী জনগণের প্রথাগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে 'বন আইন-১৯২৭' সংশোধন করা;
- তথাকথিত বনায়নের নামে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস না করা এবং আইনে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা;
- বন আইন ১৯২৭ সংশোধনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করা;
- বন আইন ১৯২৭ সংশোধনের পূর্বে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার (যেমন- বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম) নেতৃত্ব ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা;
- বনবাসী বা বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত ও তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে বন সুরক্ষা ও বন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বন বিভাগের অর্জিত আয় বন সম্প্রসারণ ও বনবাসীদের উন্নয়নে ব্যয় করা;

একটি দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২৫ ভাগ বনভূমির প্রয়োজন। ধারণা করা হয় আমাদের দেশে বন ভূমির পরিমাণ ৮ ভাগের বেশি হবে না। যেহেতু আদিবাসীরা তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বন বাঁচিয়ে রাখে তাই বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে তাঁদের সম্পৃক্ত করে বন ব্যবস্থাপনা যাতে পরিচালিত হয়, প্রস্তাবিত বন আইনে সে ধরনের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। নতুবা যে লক্ষ্যে এ আইন সংশোধন করা হচ্ছে সে লক্ষ্য পূরণ তো হবেই না, উপরন্তু বন-নির্ভর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, বন ও পরিবেশ আরো অত্যধিক পরিমাণে বিপন্ন হয়ে পড়বে যা দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনবে।

ভূমিদস্যুদের হয়রানিতে নাইক্ষ্যংছড়ির
(৩৯ পৃষ্ঠা পর)

জায়গা-জমি দখল করে রাবার চাষ করা হয়েছে। এছাড়া ডেসটিনি গ্রুপসহ ১১টিরও বেশি ব্যবসায়িক কোম্পানী অবৈধভাবে হাজার হাজার একর পাহাড় ভূমি জবরদখল করেছে। অবৈধভাবে ভূমি জবরদখলের সাথে যুক্ত কোম্পানীগুলোর মধ্যে মোস্তফা গ্রুপ, লাদেন গ্রুপ, শাহ আমীন গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, কোয়ান্টাম, পিএইচপি গ্রুপ, মেরিডিয়ান গ্রুপ, এক্সিম গ্রুপ, বাবুল গ্রুপ, একমি গ্রুপ হলো অন্যতম। এসব কোম্পানীগুলো কেবলমাত্র সাইনবোর্ড টাঙিয়ে পাহাড় ভূমি দখল করে নিয়েছে এবং উক্ত এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি ও বাঙালি অধিবাসীদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ী অধিবাসীদের উপর হামলাও করছে। স্থানীয় প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে বহিরাগতদের ভূমি জবরদখলকে প্রকারান্তরে উৎসাহিত করে চলেছে।

পাদুঝিরি চাক পাড়া থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পরিবার প্রধানের নাম:

১। চিজারি চাক, পিতা মৃত আথাই চাক;
২। থৈচিং চাক, পিতা মৃত আথাই চাক;
৩। আথুই চাক, পিতা মৃত আথাই চাক;
৪। চালাখাই চাক, পিতা সরেঅং চাক;
৫। হ্লাগ্যঅং চাক, পিতা মৃত চিংশৈ চাক;
৬। অংক্যচিং চাক, পিতা হ্লাগ্যঅং চাক;
৭। শৈমংচিং চাক, পিতা হ্লাগ্যঅং চাক;
৮। ক্যক্য চাক, পিতা হ্লাগ্যঅং চাক;
৯। চাথাউ চাক, পিতা চিজারি চাক;
১০। হ্লামংচিং চাক, পিতা হ্লাগ্যঅং চাক;
১১। ক্যমং চাক, পিতা আথোয়াই চাক;
১২। উছাথোয়াই চাক, পিতা ক্যমং চাক;
১৩। উচিং চাক, পিতা মৃত প্রুচাথোয়াই চাক;
১৪। ক্যচাহ্লা চাক, পিতা উচিং চাক;
১৫। অংচানু চাক, পিতা মৃত প্রুচাথোয়াই চাক;
১৬। অংচাগ্য চাক, পিতা মৃত থৈহ্লাখাই চাক;
১৭। ক্যচিংমং চাক, পিতা মৃত থৈহ্লাখাই চাক;
১৮। ক্যহ্লোচিং চাক, পিতা মৃত থৈহ্লাখাই চাক;
১৯। আগ্য চাক, পিতা মৃত হ্লাথোয়াইজাই চাক;
২০। মংওয়াই চাক, পিতা মৃত হ্লাথোয়াইজাই চাক;
২১। আথোয়াই চাক, পিতা মৃত হ্লাথোয়াইজাই চাক।

লংগদু চাক পাড়া থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পরিবার প্রধানের নাম:

১। চক্রাঅং চাক, পিতা মৃত রেথোয়াই চাক;
২। থোয়াইচিং চাক, পিতা মৃত জিংথোয়াই চাক;
৩। উবাথোয়াই চাক, পিতা মৃত মম্বাউ চাক;
৪। চৈজাইউ চাক, পিতা মৃত মম্বাউ চাক;
৫। লাম্রাঅং চাক, পিতা মৃত উগ্যজাই চাক;
৬। মংশৈথোয়াই চাক, পিতা থোয়াইচিং চাক;
৭। অংচাউ চাক, পিতা থোয়াইচিং চাক;
৮। মম্বাঅং চাক, পিতা মংচাখাই চাক;
৯। চাইহ্লামং চাক, পিতা মৃত মম্বাউ চাক;
১০। চাইহ্লা থোয়াই চাক, পিতা মম্বাউ চাক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি : উত্তরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই

॥ সমীচিন চাকমা ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। অতি সম্প্রতি গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। জুম্মদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালিদের এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক হামলায় ১ জন সরকারী চিকিৎসক, ১৪ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও ১ জন সংবাদদাতাসহ শতাধিক জুম্ম, ৩ জন কলেজ শিক্ষক, ৯ বাঙালি সেটেলার এবং ছাত্র আহত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগারসহ জুম্মদের বহু ঘববাড়ি ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত এ হামলায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কিংবা বিচারের আওতায় কাউকে আনা হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের কাউকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি। এভাবেই এত বড় ধ্বংসাত্মক সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত অপরাধীদের প্রশাসন তথা রাষ্ট্রযন্ত্র নির্লজ্জভাবে দায়মুক্তি প্রদান করেছে।

রাঙ্গামাটি সাম্প্রদায়িক হামলার মতো ব্যাপক ভিত্তিক না হলেও ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক জিঞ্জাংসা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে। গত ৪ আগস্ট ২০১২ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার বর্নাল ইউনিয়নের কদমতলী আদিবাসী গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হলে কদমতলী গ্রামের প্রায় ১৬৫ জন লোকজন ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এরপর গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ মাটিরাঙ্গা উপজেলার বর্ণাল ইউনিয়নের তবলছড়ি মৌজার রাজদর পাড়ার একটি ত্রিপুরা গ্রামে আবারও হামলা সংঘটিত হয় যেখানে আদিবাসী ত্রিপুরাদের একটি হিন্দু মন্দিরসহ ১৫টি ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুঠপাট করা হয়। ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে গত ২৬ আগস্ট ২০১২ আদিবাসী খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার উত্তর শান্তিপুর গ্রামে একজন নারীসহ ৩ জন পাহাড়ি বাঙালী সেটেলার কর্তৃক আক্রমণের শিকার হন। গত ১৯ অক্টোবর ২০১২ প্রিয় লাল তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক আদিবাসী জুমচাষীকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গুলিতে মারা যায়। এ বিচার-বহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।

এছাড়া অব্যাহতভাবে চলছে আদিবাসী নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, হত্যাসহ নৃশংস সহিংসতা। তার মধ্যে বিশেষভাবে দেশে-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ রাংগামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের বড়ডলু গ্রামের তুমাচিং মারমা (১৪) নামক ৮ম শ্রেণী পড়ুয়া একজন আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা। গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ রামগড় উপজেলার পাতাছড়ি ইউনিয়নের থলিপাড়ার ১৩ বছরের এক আদিবাসী ত্রিপুরা মেয়ে একই গ্রামের সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের নাক্সাছড়ি গ্রামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৩ বছর বয়সী এক আদিবাসী চাকমা কিশোরী ধর্ষণ, গত ২৬ মার্চ ২০১৩ রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নে মো: বেলাল হোসেন নামের অষ্টম শ্রেণীর এক বাঙালি সেটেলার ছাত্র কর্তৃক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া আদিবাসী এক মারমা কন্যাশিশু ধর্ষণ, গত ৯ মার্চ ২০১৩ মাটিরাঙ্গা উপজেলার মংতু চৌধুরী পাড়া এলাকায় ক্র্যাউরী মারমা (২৬) নামের এক শিক্ষিকা তার স্বামীর বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ এধরনের জঘন্য ঘটনা ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হয়ে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তথাকথিত ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী বলে খ্যাত রূপায়ণ-তাতিন্দ্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, খুন ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ক্রমাগতভাবে চলছে। ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৯১ জন সদস্যসহ এযাবৎ তিন শতাধিক ব্যক্তি খুন করেছে। ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হয়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষের সকল সহায়-সম্পত্তি বিকিয়ে সন্ত্রাসীদের মুক্তিপণ দিতে হয়েছে। তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো– গত ১৭ জুন ২০১২ সুবলং ইউনিয়নের চিলাকধাক এলাকা থেকে ১২ জন নিরীহ জুম্ম কৃষককে অপহরণ; গত ২৫ জুলাই ২০১২ বন্দুকভাঙ্গা এলাকা থেকে ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ; গত ৮ আগস্ট ২০১২ অস্ত্রের মুখে রাঙ্গামাটির রাজদ্বীপ এলাকা থেকে ২৪ জনকে নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ; গত ১৬ আগস্ট ২০১২ সুবলং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড মেম্বার চন্দ্র কুমার চাকমাকে জিম্মি এবং অমানুষিক নির্যাতন; গত ৩ ডিসেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটির সমতাঘাট থেকে স'মিলের একজন ম্যানেজারসহ ৩ জন বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ; গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ সুবলং ইউনিয়নের দিঘলছড়ি গ্রাম থেকে কমপক্ষে ১২ জন জুম্ম নারী অপহরণ; গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটির কুতুকছড়ি এলাকা থেকে গ্রামীণফোনের কর্মচারীকে অপহরণ, গত ১৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর জলযান ঘাটের নাকের ডগায় রাঙ্গামাটিস্থ রাজবাড়ী স' মিল থেকে অস্ত্রের মুখে ২ জন বাঙালি শ্রমিককে নির্বিঘ্নে অপহরণ ইত্যাদি ঘটনা অন্যতম। এসব অপহরণ ঘটনায় অপহৃত প্রায় সকলকে মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছে কিংবা অনেককে চিরতরের জন্য গুম/খুন করা হয়েছে। ইউপিডিএফ কর্তৃক অপহরণের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অংশগ্রহণ শেষে ট্রলারযোগে বাড়ি ফেরার পথে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী লংগদু উপজেলার কাট্টলী বিল হ্রদ এলাকার জোড়াটিলা নামক স্থান থেকে অস্ত্রের মুখে ৭ নারী ও শিশুসহ জনসংহতি সমিতি ও সমিতির অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে অপহরণের ঘটনা। অপহরণের পর দেড় মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রশাসন এখনো

অপহৃতদের উদ্ধার করতে পারেনি বা উদ্ধারের জন্য কোন কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সর্বশেষ লংগদু এলাকায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব চলছে। গত ৩০ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার দজরপাড়া এলাকা থেকে রূপায়ণ-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে এবং ২ এপ্রিল ২০১৩ আবার নিরীহ দু'জন গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহৃত ৬ জন ব্যক্তিকেও এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসন এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দেখেও না দেখার ভান করে প্রকারান্তরে এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে অবাধে সংঘটিত হতে সুযোগ দিয়ে চলেছে।

অপরদিকে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো আওয়ামী নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চলছে। আর মাত্র ৬/৭ মাসের মতো বর্তমান সরকারের মেয়াদ অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এ সরকার কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ফলে এ সরকারের মেয়াদ শেষপ্রান্তে এসেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন অগ্রগতি ঘটেনি। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অবনতি ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর পূর্বক বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক ভূমি কমিশন কার্যকরণকরণ ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব 'অপারেশন উত্তরণ'সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরীতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আওয়ামী লীগ সরকার বিগত নির্বাচনে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল। সরকারের মেয়াদ প্রায় সমাপ্ত হতে চললেও সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। পার্বত্য চুক্তির যে শর্তগুলো দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি আসতে পারে সেগুলি সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন হতে না পারার কারণে দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের সীমাহীন দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব বেড়ে চলেছে। স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণীত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা এখনও প্রণীত হতে না পারার কারণে পরিষদ অচল হয়ে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে বীর বাহাদুরকে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী জনগণের কাছে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে নামেমাত্র বসিয়ে রাখা হয়েছে। টাস্কফোর্সের কাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকার কারণে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী যারা এখনও পুনর্বাসিত হতে পারেনি তারা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ পরোপুরি বন্ধ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাজও মনে হয় এগিয়ে যেতে পারেনি। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে যে ৩৩টি বিভাগ হস্তান্তরের কথা চুক্তিতে ছিল এ পর্যন্ত মাত্র ১২ টি বিভাগ সরকার জেলা পরিষদকে হস্তান্তর করেছে। সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি এখনও হস্তান্তর করা হয়নি। বিশেষত আইন ও শৃংখলা, মাধ্যমিক শিক্ষা, স্থানীয় পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন, জুমচাষ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকার জেলা পরিষদে হস্তান্তর করতে পারেনি। একদিকে সরকার ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করার ফলে তাদের এলাকাব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা, অপরদিকে সমতল এলাকা থেকে আগত সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক ভূমি বেদখল, সমতলবাসীদের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার একর জমি লীজ প্রদান পূর্বক স্থায়ী অধিবাসীদের স্ব-ভূমি থেকে উচ্ছেদকরণ ও ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি পার্বত্যবাসীদের জান-মালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে বলা যেতে পারে।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির কোন সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে সেটেলার বাঙালিরা প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় ভূমিকে কেন্দ্র করে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রাস সৃষ্টি করে জুম্মদের তাদের জায়গা-জমি থেকে বিতাড়ন করে ভূমি দখলের উদ্দেশ্যেই আদিবাসী জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর একের পর ধর্ষন, হত্যাসহ পাশবিক সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান না করার কারণে আজ সেটেলার বাঙালিরা তথাকথিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' বা 'বাঙালি ছাত্র পরিষদের' ব্যানারে সংগঠিত হয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ (স্থানীয়) ইত্যাদি হস্তান্তরিত না করার কারণে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এক অরাজক ও সমন্বয়হীন অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, খুন ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম যুব সমাজের একাংশ ইউপিডিএফ ও সস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। তারা মাদকাসক্তি, জুয়াসহ অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কারণে নারীর উপর সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীরা সর্বত্র নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। তাই– পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কে না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি বলে পার্বত্যবাসী মনে করে।

বৈসাবি : বাঙালির এক ‘খিচুড়ি’ প্রত্যয়

॥ রাহমান নাসির উদ্দিন ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নববর্ষ বরণের যে ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত আছে তা ‘বৈসাবি’ নামে সমাজে জারী আছে। দেশের ছাপা এবং দৃশ্য (ইলেকট্রনিক) মাধ্যমও সে মোতাবেক বিষয়টিকে আংশিক নয়, সম্পূর্ণ রঙিনভাবে রাষ্ট্র করেছে। ফলে পাহাড়ি আদিবাসীদের বর্ষবরণের সংস্কৃতি ‘বৈসাবি উৎসব’ নামেই বাজার পেয়েছে। কিন্তু ‘বৈসাবি’ নামে পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ধরনের উৎসবই নেই, নববর্ষ বরণ তো দূরের কথা। বৈসাবিকে পাহাড়ের সকল আদিবাসীদের নববর্ষ বরণের উৎসব নামে চালানো হলেও, এটা বাঙালিদের দেওয়া একটা ‘খিচুড়ি’র নাম!

কেননা রাষ্ট্র কর্তৃক দলিলকৃত জনতাত্ত্বিক জরিপ অনুযায়ী স্বীকৃত ১১টি, কারও কারও মতে ১৩টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। এদের কোনোটিরই বর্ষবরণ উৎসবের নাম ‘বৈসাবি’ নয়। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা পুরোনো বছর বিদায় ও নতুন বছর বরণ করবার এ উৎসবকে বলে বিজু উৎসব, মারমারা বলে সাংগ্রাই, ত্রিপুরারা বলে বৈসুক বা বৈসু, খুমি ও ম্রোরা একে বলে চাংক্রাই, খিয়াং ও লুসাইরা বলে শাংগ্রাই। কিন্তু ‘বৈসাবি’ বলে কোনো উৎসবের কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসবের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

এটা মূলত বাঙালির ‘ইমপোজিশন’ (চাপিয়ে দেওয়া তকমা) যা কোনোভাবেই পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত পুরোনো বর্ষবিদায় ও নববর্ষ বরণের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না। অধিকন্তু বাঙালির আবিষ্কার করা এ খিচুড়ির মধ্যে রয়েছে একধরনের আধিপত্যের রাজনীতি, পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যকার অসম ক্ষমতার সম্পর্কের উপস্থাপনা এবং জনতাত্ত্বিক সংখ্যাগুরুত্ব বনাম সংখ্যালঘুত্বের বাঙালি-সৃষ্ট সীমারেখার নিষ্ঠুর ক্যাটেগরাইজেশন (বর্গীকরণ)।

তাই বৈসাবি-বৈসাবি করে উল্লাস করবার মধ্য দিয়ে, সংবাদ-মাধ্যমের মেধাহীন সম্প্রচারের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে একদিকে যেমন খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে; অন্যদিকে এ উপস্থাপনার ভেতর দিয়ে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার অদৃশ্য ‘এক্সক্লোশন’ (বাদকরণ) এবং ‘ইনক্লোশনের’ (আত্মীকরণ) রাজনীতিকে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ফলে এ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত বর্ষবরণের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক উৎসবকে ‘বৈসাবি’ নাম দিয়ে ফলাও করে রাষ্ট্র করা হচ্ছে। বাঙালি শহুরে নাগরিক মধ্যবিত্তের বিনোদনের লিষ্টে কেবল কিছু নতুন উপাত্ত সংযোজিত হচ্ছে; কিন্তু আখেরে পাহাড়ি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী কারও কোনো লাভ হচ্ছে না। বরং ক্ষতির তলানি ক্রমান্বয়ে অতল হয়ে উঠছে।

এদেশের সংবাদপত্রে এবং প্রচার মাধ্যমে বাঙালি-সৃষ্ট খিচুড়ি বৈসাবি যেভাবে প্রচারিত হয়, সেটা বেশ রসালো এবং চমকপ্রদ। যেমন ‘পাহাড়ের বৈসাবি উৎসব শুরু’, ‘ফুল ভাসিয়ে পাহাড়ে বৈসাবি উৎসব শুরু’, ‘বৈসাবির রঙে সেজেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম’, ‘পাহাড়ে বৈসাবি উৎসবে মাতোয়ারা’, ‘বৈসাবি উৎসবে ভাসছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা’, ‘তিন পার্বত্য জেলার বৈসাবি উৎসব শুরু’ প্রভৃতি।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে ‘বৈসাবি’ বলে কোনো উৎসব না থাকলে সব জায়গায় ‘বৈসাবি উৎসব’ লিখে এটাকে রাষ্ট্র করা হয়। যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়, ত্রিপুরাদের বৈসুক বা বৈসু উৎসবের আদ্যক্ষর ‘বৈ’, মারমাদের সাংগ্রাই উৎসবের ‘সা’ এবং চাকমাদের বিজু উৎসবের ‘বি’ নিয়ে এ নামকরণ করা হয়।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, পাহাড়ের আরও অন্যান্য যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে তারা কি বর্ষ বিদায় ও নববর্ষ বরণ উৎসব করে না? খুমি, ম্রো, খেয়াং, লুসাই, পাঙখোয়া, চাক, বম এবং তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠীর কি কোনো স্বতন্ত্র বর্ষ বিদায় ও নববর্ষ উদযাপনের রীতি-রেওয়াজ-সংস্কৃতি নেই? অবশ্যই আছে; কিন্তু সেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যকার যে জনতাত্ত্বিক কম্পোজিশন বা বিন্যাস এবং সেখানে পাহাড়ি সংখ্যাগুরুত্বের যে আধিপত্য, সেই অসম-সম্পর্কের ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোয় অন্যান্য পাহাড়ি সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠী আপনা-আপনিই বাদ পড়ে যায়।

তাছাড়া শহরের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ, শিক্ষার ক্রম-প্রসার, পেশাজীবী শ্রেণীর বিকাশ, স্বচ্ছল অর্থনৈতিক-অবস্থা, আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগের মাত্রা, প্রচলিত উন্নয়ন-ডিসকোর্সের কাঠামোয় নিজেদের অবস্থান এবং নিজের কথা নিজের মতো করে বলবার ক্ষমতা কিংবা অক্ষমতার মাপকাঠিতে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরার তুলনায় পিছিয়ে আছে অন্য পাহাড়ি আদিবাসীরা। এই তথাকথিত ‘বৈসাবি’ উৎসবের ‘বৈসাবি’ শব্দবন্ধে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাই আপনা-আপনিই মাইনাস হয়ে যায়। কিন্তু এ-মাইনাস ফর্মূলা (বাদবাদের সূত্র) যতটা না পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব, ততোধিক বাঙালিদের চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক কূটনীতি, যাকে একাডেমিক পরিভাষায় বলা হয় ‘পলিটিক্যাল ইম্পোজিশন’।

কীভাবে নতুন বর্ষ বরণ করা হবে, পুরোনো বর্ষকে বিদায় জানানো হবে এবং নতুন বর্ষের কাছে তাদের চাওয়া-চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করবে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই এর নিজস্ব ধরন ও রীতি রয়েছে। সে মোতাবেক তারা সেটা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঘরানায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন

বর্ষকে উৎযাপন করবার স্বতন্ত্র এই রূপ ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে।

সেটা যেহেতু একান্তই তাদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় পালিত হত সেহেতু সেটার মধ্যে সৌন্দর্য, মাদকতা এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুরণন ছিল। এমন কী বাঙালি নববর্ষ উদযাপনের বহু আগে থেকেই একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঘরানায় পাহাড়িরা বর্ষবরণের উৎসব করে এসেছে।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উল্লেখ্য যে, মোঘল সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে বাংলা বর্ষপঞ্জির যাত্রা শুরু; এবং তখন থেকেই বাংলা নববর্ষ পালনের রেওয়াজ চালু হয়। মূলত ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে হিজরি সন অনুসরণ করে কৃষি-খাজনা আদায়ের সংকট থেকে বাংলা বর্ষপঞ্জি আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেননা হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি-ফসলের সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। সে অসামাঞ্জস্য দূর করার জন্য সম্রাটের আদেশে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌর সন এবং আরবী হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে একটি 'ফসলী সন' হিসেবে বাংলা সনের নিয়ম নির্মাণ করেন।

১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হলেও, এ গণনা পদ্ধতি কার্যকর হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ নভেম্বর ১৫৫৬) থেকে। মূলত সম্রাট আকবরের আমল থেকেই বাংলা নববর্ষ পালনের রীতি শুরু হয় কিন্তু সেটা ছিল প্রধানত হালখাতা খোলার উৎসব যা সময়ের পরিক্রমায় আজকের এ বিপুল রূপ ধারণ করেছে।

আর পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্ষবরণের রীতি-রেওয়াজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠে। পাহাড়ি জীবন মূলত ঋতুকেন্দ্রিক, তাই ঋতুর আগমন এবং বিদায় এ মানুষদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরোনো বছরের বিদায় এবং নতুন বছরের আগমন এবং সে বিদায়-বরণ কেন্দ্র করে নানা ধরনের রিচুয়্যাল বা রীতি-নীতি পাহাড়ি জীবন-ব্যবস্থার অংশ। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন-ভাবনা, আনন্দ, নতুনকে বরণের আন্তরিক আয়োজন ও সাংস্কৃতিক উৎসব।

কিন্তু বাঙালির নজর পড়ার পর থেকে পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বর্ষবরণের রূপ, রস, গন্ধ, উপস্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবতন ঘটেছে। এখন উৎসবের চেয়ে আয়োজন বেশি, আয়োজনের চেয়ে দেখানোপনা বেশি, আর দেখানোপনার চেয়ে ভোগ-প্রবণতা বেশি। বাংলাদেশের মিড়িয়ার বেপরোয়া বিকাশের সূত্র ধরে আদিবাসীদের বর্ষবরণ উৎসব কেবল এখন আর তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মাধুর্যে পালন করবার কোনো ঋতুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি নয়, এটা এখন বাঙালি শহুরে নাগরিক মধ্যবিত্তের বিনোদনের মাধ্যমও বটে!

শহরের নাগরিক মধ্যবিত্তের মৌসুমি বাঙলা নববর্ষ বরণের সামগ্রিক আয়োজনে পাহাড়ের নববর্ষ বরণের রঙিন উপস্থাপনা তাদের মধ্যে একধরনের আদিমতার গন্ধ সরবরাহ করে। আর এ সরবরাহের মধ্যে একধরনের 'বুনো' আস্বাদ পাওয়া যায় বলে মিড়িয়া সেটা বেশ আয়োজন করে প্রচার করে। ফলে আদিবাসীদের বর্ষবরণের যে সাংস্কৃতিক নিজস্বতা, সেটা আর অটুট নেই। নগরকেন্দ্রিক কর্পোরেট সংস্কৃতির বিকাশের বাহন হিসেবে বাংলাদেশের মিড়িয়া এসব অনুষ্ঠানকে 'বৈসাবি' হিসেবে বেশুমার প্রচার করেই চলেছে। বাজার সে মোতাবেক জারি রাখবার বিষয়টি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে।

এটা সত্য যে, বাঙালি নববর্ষ উৎযাপনের পরিধি, ব্যাপকতা এবং উচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকতারও নানা রূপান্তর ঘটেছে। আগমণ ঘটেছে বেনিয়া-গোষ্ঠীর। সর্বগ্রাসী বেনিয়ারা দেশের ইতিহাস, ঐহিত্যকেও ব্যবসার পণ্য বানাবে এটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। শহুরে নাগরিক মধ্যবিত্তের ব্যস্ত জীবন-ব্যবস্থার ফাঁকে এক টুকরো বাঙালিপনার হাতছানি কিংবা মৌসুমি বাঙালি হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে চলছে নববর্ষ-কেন্দ্রিক ব্যাপক ব্যবসায়িক আয়োজন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর দ্বারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে নববর্ষের অনুষ্ঠানকে তাদের পণ্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক হারে বাড়ছে। ছাপা এবং দৃশ্য মাধ্যমও সমান তালে পাল্লা দিয়ে নববর্ষের আবেগ এবং আয়োজনকে ধারণ করবার প্রতিযোগিতায় নামে।

ফলে আবেগের চেয়ে আয়োজনের পাল্লাই ভারি হয়ে উঠে। পাহাড়ের বর্ষবরণও এ সর্বগ্রাসী থাবার বাইরে থাকেনি। বহুজাতিক কোম্পানি এখন পাহাড়ের বর্ষবরণের নানা অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। বাঙালির নজর পড়া কিংবা মিড়িয়ার রসালো উপস্থাপনার পাশাপাশি, বেনিয়ার থাবার কারণেও পাহাড়ের বর্ষবরণের জৌলুস তার নিজস্বতা হারাচ্ছে।

তাছাড়া পাহাড়ের বর্ষবরণের রীতি ও সংস্কৃতিকে বাঙালির নিজস্ব বর্ষবরণের সঙ্গে মিলিয়ে এবং মিশিয়ে ভাববার এবং উপস্থাপনা করবার প্রবণতা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, এ জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন বর্ষবরণ উৎসব খণ্ডিত 'বৈসাবি' রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং কোনো কিছুই আজ পুঁজি আর পুঁজির থাবার বাইরে নেই।

এখানে মনে রাখা জরুরি যে, বাইরের চাপিয়ে দেওয়া কোনো ডিসকোর্সই নিরপরাধ কিংবা নিঃস্বার্থ নয়। তাছাড়া যাদের ওপর এ ডিসকোর্স চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা সেটাকে কীভাবে নিচ্ছে কিংবা এ প্রক্রিয়ায় তাদের মনোভঙ্গি কী সেটা জানাও জরুরি। সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উৎসবকে নিজের মতো করে উপস্থাপন করা এক ধরনের রাজনৈতিক কূটিলতা। তেমনি এ জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় ডিসকোর্সের ভেতর দিয়ে অন্যের বিনোদনের উপাত্ত হিসেবে বাজারে সেল করাও একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা।

এ থেকে আমরা যত দ্রুত বের হয়ে যেতে পারব, তত পাহাড়ি আদিবাসী ও সমতলের বাঙালি উভয়ের লাভ। কেননা ভিন্ন সংস্কৃতিকে যথাযথ সম্মান ও সুরক্ষার মধ্যেই নিজের সংস্কৃতির মাহাত্ম্য নিহিত থাকে।

ড. রাহমান নাসির উদ্দিন: সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। হুমবোল্ট ভিজিটিং ফেলো হিসেবে জার্মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : সরকারের মরিয়া উদ্যোগ, এলাকাবাসীর আপত্তি ও বিদ্যমান বাস্তবতা

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাঙ্গামাটি সফরকালে সার্কিট হাউজে বোতাম টিপে একযোগে প্রায় এক ডজনের মতো বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভিত্তি প্রস্তর উন্মোচন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ মার্চ ২০১৩ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালীতে স্থান পরিদর্শনে আসেন এক সরকারী প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম ত্রিপুরা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোস্তফা কামাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান তরুন কান্তি ঘোষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল স্থানীয় গ্রামবাসীর তোপের মুখে পড়েন বলে জানা যায়। স্থানীয় আদিবাসী জুম্ম অধিবাসী এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে আসছে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ করে এই আশঙ্কায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তারা নিজ জায়গা-জমি থেকে পুনরায় উচ্ছেদ হয়ে পড়বে এবং অত্রাঞ্চলের জন্য আরেকটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

> “এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য যদি হয় পার্বত্যবাসীর উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানো, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও এসব বিষয়ের অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা যায়।”

এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আগের সরকার (১৯৯৬-২০০১) রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয় রাঙ্গামাটি উপজেলাধীন ১০৪ নং ঝগড়াবিল মৌজায়। ঝগড়াবিলসহ বালুখালী, মগবান, জীবতলী ইউনিয়নে বসবাস করে আদিবাসী চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী। ষাট দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে তাদের বাস্তুভিটা ও ধান্যজমি হ্রদের পানিতে ডুবে যায়। চাষোপযোগী জমি না থাকায় সেসময় তাদেরকে উচ্চভূমিতে (পাহাড় ভূমি) পুনর্বাসন প্রদান করা হয় যেখানে তারা বাস্তুভিটা ও বাগান-বাগিচা গড়ে তুলেছে। এজন্য এ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তারা পুনরায় উচ্ছেদ হয়ে পড়বে এবং পুনর্বাসন করার মতো কোন জায়গা-জমি না থাকায় তারা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। এজন্য এ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করার জন্য সে সময় তারা সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। তারই ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন চারদলীয় সরকারের আমলেও একই দাবিতে এলাকাবাসী স্মারকলিপি প্রদান করে এবং তৎপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার ২০০৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাতিল করে।

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠিত হলে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পুনরায় উদ্যোগ নেয়া হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থানের জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ঝগড়াবিল মৌজার অধিবাসীরা উক্ত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করার দাবি জানিয়ে গত ১১ মে ২০০৯ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বরাবরে পুনরায় স্মারকলিপি প্রদান করে। এমতাবস্থায় গত ৫ জুলাই ২০০৯ শিক্ষামন্ত্রী ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করেন যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাও অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় শ্রী লারমা পূর্বাপর ঘটনাবলী ও এলাকাবাসীর আপত্তির কথা তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি আরও বলেন যে, এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য যদি হয় পার্বত্যবাসীর উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানো, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও এসব বিষয়ের অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা যায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিন পার্বত্য জেলার এসব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধিকতর বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করার জন্য অনেক আগে থেকেই পার্বত্যবাসী দাবি করে আসছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সেজন্য তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে স্থানীয় জনগণের মতামত নেয়ার জন্য রাঙ্গামাটিতে একটি মতবিনিময় সভা আহ্বানের প্রস্তাব করেন। সেসময় শ্রী লারমার অভিমত ও প্রস্তাবের প্রতি খাগড়াছড়ির সাংসদ

ও প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা এবং বান্দরবানের সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর উশৈ চিংও সমর্থন প্রদান করেন। তারই আলোকে সেই সভায় রাঙ্গামাটিতে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, সভায় কার্যবিবরণীতে রাঙ্গামাটিতে মতবিনিময় সভা আয়োজনের সিদ্ধান্তের কথা লেখা হলেও প্রস্তাবিত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণের কোন কথাই লেখা হয়নি।

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ১০ মার্চ ২০১০ তারিখে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারকে সাথে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাঙ্গামাটি সফর করেন। তারা ঝগড়াবিল মৌজার প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং রাঙ্গামাটি পৌর মিলনায়তনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও উত্তরণে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, শিক্ষামন্ত্রীর এই সফর ও মতবিনিময় সভা বিষয়ে যথাসময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে জানানো হয়নি। মতবিনিময় সভার দু'দিন আগে রাঙ্গামাটি জেলার ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় থেকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য ফোনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে জানানো হয়। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের বান্দরবানে পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সভায় তাঁকে কথা বলার কোন সুযোগই দেয়া হয়নি, খুব সম্ভবত প্রস্তাবিত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিপক্ষে বলতে পারেন এই ভয়ে।

এমনি এক অবস্থায় গত ১৯ জুলাই ২০১০ স্থানীয় অধিবাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার জন্য পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির বরাবরেও উক্ত স্মারকলিপির অনুলিপি প্রেরণ করা হয়। এপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাতিল করার সুপারিশ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হয়। তার পরিবর্তে তিন পার্বত্য জেলার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে অধিকতর বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা, শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসনে ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর কোটা সংরক্ষণ করার সুপারিশ করা হয় আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে।

এমনিতর আপত্তি সত্ত্বেও তথা প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর উন্মোচন করে গেলেন। সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানকার অধিবাসীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনমানুষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসা। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে স্থানীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর সুযোগ পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে ইত্যাদি। সরকারের এসব যুক্তি উপস্থাপন করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উচ্চশিক্ষা প্রসার ও তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কোনকিছুই উল্লেখ নেই।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১ এর প্রস্তাবনায় বলা হয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান প্রাগ্রসর বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ, পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণকল্পে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটি জেলা সদরের ঝগড়াবিল মৌজায় 'রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদতা, স্বাতন্ত্র্যতা, জাতিবৈচিত্র্যতা, বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যে কোন জাতি, ধর্ম, গোত্র এবং শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকবে। এছাড়া আইনে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্টারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আদিবাসী জুম্ম তথা স্থায়ী অধিবাসীদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী সংস্থা হচ্ছে রিজেন্ট বোর্ড। সেই রিজেন্ট বোর্ড গঠনেও আদিবাসী জুম্ম তথা স্থায়ী অধিবাসীদের থেকে সদস্য নিয়োগের সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৮ নং ধারায় ২৫ সদস্য বিশিষ্ট রিজেন্ট বোর্ড গঠনে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বৃহত্তর রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন দু'জন শিক্ষক এবং সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত দু' জন সংসদ সদস্য, যাঁদের মধ্যে একজন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার হবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর মধ্য দিয়েও আদিবাসী জুম্ম তথা স্থায়ী অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৮ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, বেসরকারী ও পরিষদীয় চাকুরীতে আদিবাসী জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগের বিধান রয়েছে। এই বিধানের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে বিধিব্যবস্থা রাখা হয়নি।

সরকারের তরফ থেকে মৌখিকভাবে যুক্তি দেয়া হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে বা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নেয়া হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারও কতটুকু বাস্তবতা বিরাজ করছে? মফস্বল অঞ্চলের এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে যেখানে ১০/১২ হাজার ছাত্রছাত্রী থাকে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের থেকে কতজন ছাত্রছাত্রীই বা পাওয়া যাবে? বড়জোর ৩০০ বা ৫০০? সুতরাং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বহিরাগত ছাত্রছাত্রীরা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের এমন কোন শিক্ষাগত, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে উঠেনি যার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী

পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের থেকে নিয়ে আসা যাবে। তিন পার্বত্য জেলায় মাত্র ২৫টি কলেজ (সরকারী-বেসরকারী মিলে) রয়েছে। এসব কলেজ থেকে প্রত্যেক বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাশকরা সকল ছাত্রছাত্রীদের যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে ভর্তি করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-দশমাংশ ছাত্রছাত্রীর আসন পূরণ করা যাবে বলে প্রতীয়মান হয় না। তার উপর রয়েছে ভর্তি হওয়ার মতো ন্যূনতম যোগ্যতা। দেখা যাবে যে, পার্বত্যাঞ্চলের কলেজগুলো থেকে প্রত্যেক বছর পাশকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম নেয়ার মতো যোগ্যতা নেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো আশানুরুপ গুণগত মান গড়ে উঠেনি। পার্বত্যাঞ্চলের দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থা, দুর্গম অঞ্চলে আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর বসবাস ও তাদের চরম দারিদ্রতা, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের আবাসনের সমস্যা, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চরম দুর্নীতি, আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অনুপস্থিতি ইত্যাদির কারণে পার্বত্যাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাও তার থেকে ব্যতিক্রম নেই। বিশেষ করে অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব, সর্বোপরি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় পর্যাপ্ত সরকারী অনুদানের অভাবের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাও ধুঁকে ধুঁকে চলছে। ফলশ্রুতিতে দেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্কুল থেকে শিশু ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি।

অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলায় যে তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে যে কতিপয় বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে সেগুলো শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ইংরেজি ইত্যাদি ৭টি বিষয়ে আর মাষ্টার্স কোর্স রয়েছে মাত্র রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে। ৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্স থাকলেও উক্ত বিষয়ে কোন মাষ্টার্স কোর্স নেই। আর রাঙ্গামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলার সরকারী কলেজগুলোর বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকের সংকট, শিক্ষকের জন্য আবাসন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শিক্ষা উপকরণের অভাব। যেমন রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ হচ্ছে একটি ঐতিহ্যবাহী পুরোনো কলেজ যেখানে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের প্রায় সকল বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীতে পড়ানো হয়। কিন্তু এত বড় কলেজের এতগুলো বিষয়ে শিক্ষক রয়েছে মাত্র ৫০ জন। আর রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাষ্টার্স শ্রেণীর জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র দু' জন। তাদের পক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত ক্লাসগুলো নেয়া কত বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তা বলাই বাহুল্য। আর শিক্ষকদের জন্য কোন আবাসনের ব্যবস্থা নেই। একটি ছাত্রাবাস থাকলেও তা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ক্লাসের জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ বা ভবন নেই। অথচ রাঙ্গামাটি কলেজের অবকাঠামো গড়ে তোলার মতো মোটামুটি জায়গা রয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য কয়েকবার সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিকল্পনা নেয়া হলেও আজ অবধি তা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। কলেজে অনেক শিক্ষক বদলি হয়ে আসলেও কয়েক দিন পরে আবার অন্যত্র চলে যান। এভাবে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু সে বিষয়ে সরকারের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের অবস্থা আরো বেশি খারাপ। বান্দরবান সরকারী কলেজে অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে রাজনীতি বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এ দু'টি কলেজে কোন মাষ্টার্স কোর্স নেই। প্রসঙ্গত ইহাও প্রনিধানযোগ্য যে, তিন পার্বত্য জেলায় ২৫টি বেসরকারী কলেজ রয়েছে। এসব কলেজ প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে নানাবিধ সমস্যায় মুখোমুখী হয়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব শিক্ষকদের আবাসনের সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ বরাদ্দ প্রদান না করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে বিবেচনা করা যায়।

অথচ সদাসয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রসারে এসব সমস্যার নিরসনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জনমতের বিপরীতে তথা জুম্মদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনা না করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি করছে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে নিম্নোক্ত সমস্যাবলী সৃষ্টি হতে পারে–

- শত শত আদিবাসী জুম্ম পরিবার তাদের বাস্তুভিটা ও বাগান-বাগিচা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে, যারা ষাট দশকে কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছিল। কাপ্তাই বাঁধের মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলেও আদিবাসী জুম্মরা ক্রমাগতভাবে তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে।
- আদিবাসী জুম্মদের কাপ্তাই বাঁধের পর গড়ে তোলা বাগান-বাগিচা পরিত্যাগ করতে হবে। ফলে তাদের জীবনজীবিকার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক, স্টাফ ও ছাত্র হবে দেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে। তার অর্থ হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াবে বহিরাগত বাঙালিদের বসতি প্রদানের একটি নতুন ও শক্তিশালী কেন্দ্র। দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি থেকে কাপ্তাই এবং বালুখালী ইউনিয়নের জীবতলীস্থ নেভী ক্যাম্প পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে বহিরাগত বাঙালি অধ্যুষিত বসতিতে পরিণত করার কৌশলগত দিক হিসেবে রেখেই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- সেটেলার বাঙালিদের বসতির কারণে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর নেতিবাচক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়বে।

বিশেষ প্রতিবেদন

৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে এবং আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে

সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইনের একতরফা ও বিতর্কিত উদ্যোগ

অতি সম্প্রতি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভার সিদ্ধান্ত এবং ৩০ জুলাই ২০১২ আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তবলী উপেক্ষা করে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে একতরফা ও বিতর্কিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরেক জটিলতা সৃষ্টি করবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করে। তারপর সরকারের বিভিন্ন স্তরে অনেক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত আইনের ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এরপর ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মতামতের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পাঠানো হলে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায়ও উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

উপরোক্ত প্রত্যেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সভার পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে। কিন্তু এখনো উক্ত আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনার্থে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়নি। এমনকি আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৯ মাস অতিক্রান্ত হলেও আজ অবধি উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয়নি। পক্ষান্তরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেসুর রহমানসহ ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উক্ত সভাগুলোতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কমিশনের কার্যপরিধি, কোরাম ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিরোধিতা করে ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনে বাধা প্রদান করে আসছে। অধিকন্তু প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকেও এ ধরনের আপত্তি জানিয়ে আইন সংশোধনে বাধা প্রদান করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এমনি এক অবস্থায় গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর (যিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি রেখেছিলেন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার ও সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও তাঁর একান্ত সচিব বাসুদেব আচার্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেসুর রহমানসহ ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেসুর রহমান ইতিপূর্বে গৃহীত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা (শর্তাংশ) সংক্রান্ত ৬(১)(গ) ধারা, সভার কোরাম সংক্রান্ত ৭(৩) ধারা ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত ৭(৫) ধারাসহ গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে মতামত তুলে ধরেন এবং তাঁর মতামতের ভিত্তিতে উক্ত সভার কার্যবিবরণীও গ্রহণ করা হয় বলে জানা গেছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে অতি দ্রুততার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন-এর সংশোধনী বিল প্রণয়ন করেছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য যে, আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নয় মাস পরও উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা না হলেও গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অতি দ্রুততার সাথে লেখা হয়েছে বলে জানা গেছে। দ্বিতীয়তঃ গত ২২ জানুয়ারি ২০১২ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাগুলোতে পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও খসড়া সংশোধনী বিল প্রণয়ন বা সংসদে উত্থাপনের কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি; অথচ গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে দ্রুত সংশোধনী বিলের খসড়া প্রস্তুত করা

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ প্রতিবেদন

ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে গণ-অপহরণ: ইউপিডিএফের উদ্ভট শর্তারোপ ও প্রশাসনের নির্লিপ্ততা

রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অংশগ্রহণ শেষে ট্রলারযোগে বাড়ি ফেরার পথে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী লংগদু উপজেলার কাট্টলী বিল হ্রদ এলাকার জোড়াটিলা নামক স্থান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে ৭ নারী ও শিশুসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সমিতির অঙ্গ সংগঠনের প্রায় ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে অপহরণ করে। অপহরণের পর ২০ ফেব্রুয়ারি নারী, শিশু ও বৃদ্ধ ৯ জনকে ছেড়ে দিলেও (এছাড়া ১ জন পালিয়ে আসে) অবশিষ্ট ৫২ জন ব্যক্তি এখনো ইউপিডিএফের জিম্মিদশায় রয়েছে। আজ প্রায় আড়াই মাস অতিবাহিত হলেও অবশিষ্ট অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি; অপরদিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরাও অবশিষ্ট অপহৃতদের কাউকেই ছেড়ে দেয়নি। প্রশাসন কর্তৃক অবশিষ্ট অপহৃতদের উদ্ধার না করা বা ইউপিডিএফর কর্তৃক ছেড়ে না দেয়ায় অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী অপহৃতদের জীবন নিয়ে চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, তপন জ্যোতি চাকমা বর্মা ও প্রবীর চাকমা বিশালের নেতৃত্বে সেনা পোশাক পরিহিত ইউপিডিএফের ১৮ জনের একটি সশস্ত্র দল দু'টি ইঞ্জিন চালিত বোট নিয়ে দু' দলে ভাগ হয়ে জোড়াটিলা নামক স্থানে হ্রদ এলাকায় আগে থেকে উৎপেতে থাকে। সকাল আনুমানিক ১০:০০ টার দিকে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বহনকারী ট্রলারটি জোড়াটিলা এলাকায় পৌঁছলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে আটক করে। আটকের পর সাথে সাথে সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের কাছ থেকে সকল মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এরপর অপহৃতদের বহনকারী ট্রলারের দু' দিকে ঘিরে বন্দুক তাক করে লংগদু উপজেলার সীমান্তবর্তী সুবলং ইউনিয়নের উকছড়ি গ্রামের দিকে রওনা দেয়। জলপথে প্রায় আধ ঘন্টা যাওয়ার পর সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের নিয়ে উকছড়ি গ্রামে ভিড়ায়। সেখান থেকে গ্রামের পথ ধরে সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের নিয়ে দুর্গম মৌন এলাকায় দিকে রওনা দেয়। একপর্যায়ে তারা উকছড়ি গ্রামে শিশু, বৃদ্ধ ও নারী ১০ জনকে রেখে অবশিষ্ট ৫২ জনকে নিয়ে লংগদু ও নানিয়ারচর উপজেলার মধ্যবর্তী দুর্গম মৌন এলাকায় নিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

বলাবাহুল্য, যে লংগদুর কাট্টলী বিলের (হ্রদ) জোড়াটিলা এলাকা (১০ নম্বরও বলা হয়) থেকে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের অপহরণ করা হয়েছে সেই জোড়াটিলা এলাকার কাছাকাছি তিনটি ক্যাম্প রয়েছে। জোড়াটিলা এলাকার পূর্ব দিকে রয়েছে কুসুমছড়ি এপিবিএন ক্যাম্প, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাজাছড়ি (বরনাছড়ি) এপিবিএন ক্যাম্প এবং উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে কাট্টলী পুলিশ ফাঁড়ি। জোড়াটিলা এলাকা থেকে এসব ক্যাম্পের দূরত্ব আনুমানিক দেড় কিলোমিটারের মধ্যে, যা ট্রলারযোগে আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগার কথা। জোড়াটিলা এলাকায় ঘেরাও'র মধ্যে পড়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অপহৃতদের কয়েকজন মোবাইলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ার খবর জনসংহতি সমিতির উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে জানান এবং সমিতির নেতৃবৃন্দ সাথে সাথে জেলা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। গ্রহণ করা হলে কূলে ভিড়ার আগেই কাপ্তাই হ্রদ এলাকার মধ্যে সন্ত্রাসীদের আটকানো যেতো; কেননা জোড়াটিলা এলাকা থেকে ট্রলারযোগে উকছড়ির কূলে ভিড়তেও আধ ঘন্টার মতো সময় লেগেছিল। এছাড়া উকছড়ি গ্রাম থেকে লংগদু ও নানিয়ারচর উপজেলার মধ্যবর্তী দুর্গম মৌন এলাকায় পৌঁছতে জনবসতিপূর্ণ গ্রাম এলাকা অতিক্রম করতেও ২/৩ ঘন্টা সময় লাগার কথা। সেই সময় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিলে অপহৃতদের উদ্ধার করতে পারার একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী থেকে কেবল এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে পারবে না, উদ্ধারের সরাসরি অভিযান করলে অপহৃতদের জীবন বিপন্ন হবে, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছে ইত্যাদি নানা অজুহাত তুলে সময় ক্ষেপণ করা হয়ে থাকে।

অপহরণের পর দেড় মাস অতিক্রম হলেও বর্তমানে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খনা বাহিনী যারপরনাই নীরবতা পালন করে চলেছে যেন মনে হবে এলাকায় অর্ধ-শতাধিক লোকের গণ-অপহরণের মতো কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন তৎপরতা নেই। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নীরবতা দেখে দৃশ্যত মনে হয় জননিরাপত্তা প্রদানে প্রশাসনের যেন কোন দায়িত্বই নেই। প্রকাশ্য দিবালোকে ইউহিডিএফের চেলা-চামুণ্ডারা ঘুরাফিরা করছে, এমনকি তাদের সাথে মেলামেশাও করছে কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করছে না বা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও নিচ্ছে না। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপহরণকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এভাবেই আজ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ রাষ্ট্রযন্ত্র ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। ইউপিডিএফ'কে দিয়ে অবাধে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস জারী

রাখার পেছনে শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকারান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা।

অপরদিকে অপহরণের পর ইউপিডিএফ অপহৃতদের নিয়ে নানা লুকোচুরি খেলা খেলতে শুরু করে। অপহরণের পর পরই অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজনরা ইউপিডিএফের সাথে দেখা করতে চাইলে অপহরণকারী হোতা তপন জ্যোতি চাকমা বর্মা ও প্রবীর চাকমা বিশাল কেবল ফোনে কথা বলতে থাকে; সরাসরি সাক্ষাৎ প্রদান থেকে অব্যাহতভাবে বিরত থাকে। অবশেষে আত্মীয়-স্বজনদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, ইউপিডিএফের কারো সাথে যোগাযোগ না করে খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকায় গিয়ে সরাসরি প্রদীপন খীসার সাথে দেখা করতে। এই গণ-অপহরণের বিষয়টি দেখাশুনার দায়িত্ব ইউপিডিএফের পক্ষ থেকে প্রদীপন খীসাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

অতঃপর লংগদু ও বাঘাইছড়ি এলাকার গণমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজনদের একটি দল খাগড়াছড়ি গিরিফুল এলাকায় ইউপিডিএফের প্রদীপন খীসার সাথে দেখা করতে পাঠানো হয়। সেখানে প্রদীপন খীসা অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার কাছে যেতে নির্দেশ দেয় এবং অপহৃতদের মুক্তির জন্য 'জনসংহতি সমিতি-ইউপিডিএফ এর মধ্যে সমঝোতা করা', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সন্তু লারমার পদত্যাগ করা' ইত্যাদি উদ্ভট ও অবান্তর শর্তারোপ করে।

এরপর গত ২১ ফেব্রুয়ারি অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাঙামাটিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যে, নিরীহ-নিরস্ত্র লোকদের অস্ত্রের মুখে গণ-অপহরণের মাধ্যমে জিম্মি করে কোন কিছু দাবি করা বা মুক্তির জন্য শর্তারোপ করা মানবতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বৈ কিছু নয়। এ ধরনের ঘৃণ্য কায়দায় কোন দাবি করা সন্ত্রাসবাদীরাই করে থাকে এবং এ ধরনের সন্ত্রাসবাদী দাবি কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বলাবাহুল্য, নিরস্ত্র-নিরীহ লোকদের অপহরণ করে বা জিম্মি করে ঐক্যের ডাক দেয়া রাজনৈতিক লক্ষ্য-প্রসূত বা জাতীয় স্বার্থ-প্রসূত হতে পারে না। অপহরণ-জিম্মির মাধ্যমে অন্য যা কিছু আদায় করা যাক না কেন, সেটা রাজনৈতিক বা জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। এটা স্রেফ সন্ত্রাস করা। রাজনৈতিক ঐক্য হয় রাজনৈতিকভাবে। জাতীয় ঐক্য হয় রাজনৈতিক ভিত্তির উপর। কিন্তু জিম্মি করে বা অপহরণ করে কোন ঐক্য হয় না। অতএব অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দাবি আদায়ের সন্ত্রাসী ও বর্বরোচিত পন্থা পরিহার পূর্বক অবশিষ্ট অপহৃতদের অনতিবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি প্রদানের জন্য অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ও প্রেসবিজ্ঞপ্তির প্রচার করে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে অপহরণকারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে এও জানানো হয় যে, যে কোন সমঝোতা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সংলাপের মাধ্যমে বা রাজনৈতিকভাবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যেতে পারে।

এরপর গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যস্থতাকারী গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অপহৃত আত্মীয়-স্বজনরা ইউপিডিএফের প্রদীপন খীসার সাথে আবার দেখা করতে যায় এবং আলোচনা পর অপহৃতদের ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস পেয়ে তারা খুশি মনে বাড়ি ফিরে আছেন। সেসময় প্রদীপন খীসা অপহৃতদের খাওয়া-দাওয়া বাবদ অর্থ দাবি করে। এই ধারাবাহিকতায় যোগাযোগের মাধ্যমে গত ২ মার্চ প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ি নারানখিয়ায় গিয়ে পুর্ব প্রতিশ্রুত অনুসারে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে মোট দুই লাখ ষাট হাজার টাকা প্রদীপন খীসার নিকট জমা দেন প্রতিনিধিবৃন্দ। কিন্তু টাকা নেয়ার পর সেদিন ইউপিডিএফ অপহৃতদের কাউকে তো মুক্তি দেয়নি, উপরন্তু প্রতিনিধিদের কাউকেই কোন কথা বলতেও দেয়নি। সরাসরি আবার জনসংহতি সমিতির সভাপতির নিকট কথা বলার জন্য রাঙামাটি যেতে প্রতিনিধিদেরকে নির্দেশ দেয় প্রদীপন খীসা।

এভাবেই ইউপিডিএফ অপহৃতদের নিয়ে নানা ভেলকিবাজি ও লুকোচুরি খেলা খেলছে। ইউপিডিএফ নিজেরাই অপহরণের ঘৃণ্য অপকর্ম সংঘটিত করে, আর উল্টো জনসংহতি সমিতিকে শর্তারোপ করে। এমনকি অপহৃত মৃগসোনা চাকমার স্ত্রী রীনা চাকমা গত ১৪ মার্চ ২০১৩ এবং পিতা মঙ্গলচান চাকমা গত ৭ এপ্রিল ২০১৩ বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের লাম্বাছড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে মারা যাওয়ার পরও মৃগসোনা চাকমাকে ছেড়ে দেয়নি ইউপিডিএফ। অপহৃতদের মধ্যে যে ৯ জন ছাত্র রয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারীরা অনুরোধ করলেও তাদেরও ছেড়ে দেয়নি ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। অপহরণের পর আড়াই মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও অপহৃতরা মুক্তি না পাওয়ায় অপহৃতদের আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে মৃগসোনা চাকমার স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুর পরে তাকে মুক্তি না দেওয়ায় অপহৃতদের জীবন নিয়ে এ উদ্বেগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অপহৃত আত্মীয়-স্বজন ভয়ে কোন মামলা দায়ের করেনি। পুলিশ কোন মামলা বা সাধারণ ডায়েরীও নথিভুক্ত করেছে বলে জানা যায়নি।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইউপিডিএফ জন্মলগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, খুন ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ইউপিডিএফের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা এবং সে লক্ষ্যে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অশান্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। জন্মলগ্ন থেকে ইউপিডিএফ এযাবৎ তিন শতাধিক ব্যক্তিকে খুন করেছে। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হয়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষের সকল সহায়-সম্পত্তি বিকিয়ে সন্ত্রাসীদের মুক্তিপণ দিতে হয়েছে। তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো– গত ১৭ জুন ২০১২ সুবলং ইউনিয়নের চিলাকধাক এলাকা থেকে ১২ জন নিরীহ জুম্ম কৃষককে অপহরণ; গত ২৫ জুলাই ২০১২ বন্দুকভাঙ্গা এলাকা থেকে ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ; গত ৮ আগস্ট ২০১২ অস্ত্রের মুখে রাঙ্গামাটির রাজদ্বীপ এলাকা থেকে ২৪ জনকে নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ; গত ১৬ আগস্ট ২০১২ সুবলং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড মেম্বার চন্দ্র কুমার চাকমাকে জিম্মি এবং অমানুষিক নির্যাতন; গত ৩

ডিসেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটির সমতাঘাট থেকে স'মিলের একজন ম্যানেজারসহ ৩ জন বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ; গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ সুবলং ইউনিয়নের দিঘলছড়ি গ্রাম থেকে কমপক্ষে ১২ জন জুম্ম নারী অপহরণ; গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটির কুতুকছড়ি এলাকা থেকে গ্রামীণফোনের কর্মচারীকে অপহরণ; গত ১৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর জলযান ঘাটের নাকের ডগায় রাঙ্গামাটিস্থ রাজবাড়ী স' মিল থেকে অস্ত্রের মুখে ২ জন বাঙালি শ্রমিককে নির্বিঘ্নে অপহরণ ইত্যাদি ঘটনা অন্যতম। এসব অপহরণ ঘটনায় অপহৃত প্রায় সকলকে মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছে।

মোট কথা সুবলং-লংগদু-বন্দুকভাঙ্গার হ্রদ এলাকা যেন ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অপহরণের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এসব অপহরণের ঘটনা একের পর এক সংঘটিত করে চললেও আশ্চর্যের বিষয় যে, এসব ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনের কোন ন্যূনতম চেষ্টাও করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বরাবরই বিরত রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, ইউপিডিএফের সাথে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লেজে-গোবরে সম্পর্ক না থাকলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অবাধে একের পর এক সন্ত্রাস ও অপহরণের ঘটনা সংঘটিত করার কোন সুযোগ পেতো না। এ কারণেই আজ সুবলং-লংগদু-বন্দুকভাঙ্গার হ্রদ এলাকা যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অপহরণের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিণত হয়েছে এসব সুবলং-লংগদু-বন্দুকভাঙ্গার হ্রদ এলাকা।

বর্তমানে ইউপিডিএফের জিম্মিদশায় আটক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫২ জন সদস্য ও সমর্থকদের তালিকা:

লংগদু উপজেলা-

১. মনিশংকর চাকমা (৩৫) পীং বীরেন্দ্র লাল চাকমা, গ্রাম-বড়াদম, লংগদু
২. যশো চাকমা (২৫), ভূপতি রঞ্জন চাকমা, রাঙ্গীপাড়া, লংগদু
৩. বিনয় সাধন চাকমা (২৩), পীং কিনারাম চাকমা, শিলপাদাছড়া, লংগদু (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
৪. ভূমিত্র চাকমা (১৮), পীং সুমতি রঞ্জন চাকমা, ইয়ারেংছড়ি, লংগদু (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
৫. অমরকান্তি চাকমা, পীং বহন্দ চাকমা, ঘনমোর, লংগদু (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
৬. অন্তর চাকমা (১৮) পীং- স্মৃতি বিকাশ চাকমা, গ্রাম- দাদীপাড়া
৭. সুইন চাকমা (১৭), পীং জ্ঞানজ্যোতি চাকমা, চাল্যাতলি, লংগদু (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
৮. এটম চাকমা (১৯), পীং- সূর্য কুমার চাকমা, বগাচদর, চিবেরেগা, লংগদু (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
৯. বিজয় চাকমা (১৭), পীং- চিগন চান চাকমা, লংগদু
১০. মিলন চাকমা (৩০) পীং- রঞ্জিত কার্বারী (কালা), রাঙ্গীপাড়া
১১. দয়াল কান্তি চাকমা (২০), পীং অমলেন্দু চাকমা চাকমা, চাল্যাতলী (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
১২. শুভশান্তি চাকমা (২৮) পীং বরুন কুমার চাকমা, সাং শান্তিনগর, গুলশাখালী
১৩. মেনশন চাকমা মিলন (৩২), পীং সুশান্ত চাকমা, সাং শান্তিনগর, গুলশাখালী
১৪. সুখময় চাকমা (৩৮), পীং রিজাব চন্দ্র চাকমা, গুলশাখালী
১৫. লাল বাহাদুর চাকমা ওরফে রত্ন কুমার (৪৫), পীং মৃত ব্রজেন্দ্র চাকমা, ঘনমোর
১৬. লক্ষ্মী কার্বারী (৫৫), পীং মৃত ভারত চন্দ্র চাকমা, ঘনমোর
১৭. বিজয়গিরি চাকমা (৪০), পীং ব্রজেন্দ্র চাকমা, ঘনমোর
১৮. স্নেহ কুমার চাকমা (৪৫) পীং চন্দ্র কান্তি চাকমা, ঘনমোর
১৯. সমরাজ চাকমা পীং তিলকচন্দ্র চাকমা, ঘনমোর
২০. অনিল বিহারী চাকমা, পীং মৃগকান্তি চাকমা, ঘনমোর
২১. রিপন জ্যোতি চাকমা, পীং মৃত নরেন্দ্র চাকমা, ঘনমোর
২২. সুজন চাকমা (১৯), পীং জিতেন্দ্র চাকমা, শিলপাদাছড়া (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
২৩. অমর চাকমা (১৯), পীং রমনী চাকমা, রাঙ্গীপানিছড়া, লংগদু (ছাত্র, শিজক কলেজ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)
২৪. রিকন চাকমা (১৯), পীং রসিক মোহন চাকমা, বগাচদর, চিবেরেগা, লংগদু (ছাত্র, লংগদু রাবেতা কলেজ)
২৫. সোহেল চাকমা (২২), পীং কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম মহাজন পাড়া, লংগদু

বরকল উপজেলা

২৬. তাপস চাকমা পরিমল মেম্বার (৪৩), পিতা মৃত চন্দ্রধর চাকমা, গ্রাম কুসুমছড়ি, বরকল (৯ নং ওয়ার্ড মেম্বার, বরকল ইউনিয়ন)

বাঘাইছড়ি উপজেলা-

২৭. কৃষ্ণমনি চাকমা (৪০), পিতা মৃত দীন মোহন চাকমা, গ্রাম পেরাছড়া, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
২৮. শুক্রমনি চাকমা (৩৩), পিতা বানেশ্বর চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
২৯. লক্ষ্মীশংকর চাকমা (৩৬), পিতা কামিনী কুমার চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৩০. শান্তি কুমার চাকমা (৩৩), পিতা মৃত পত্যারাম চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৩১. সুরেশ চাকমা (৩২), পিতা মৃত মঙ্গল ধন চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৩২. মৃগসোনা চাকমা, পীং মঙ্গলচান চাকমা, উত্তর খাগড়াছড়ি, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৩৩. উগ্রমনি চাকমা (৩২), পিতা বানেশ্বর চাকমা, গ্রাম উত্তর খাগড়াছড়ি, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৩৪. লক্ষ্মীমনি চাকমা (৪৬), পিতা মৃত পহরচান চাকমা, গ্রাম উত্তর শিজক, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য
৩৫. বিনয় কান্তি চাকমা বিটু (৩০), পিতা মতিলাল চাকমা, গ্রাম দক্ষিণ সার্বোয়াতলী
৩৬. নয়ন বিকাশ চাকমা (৩৫), পিতা লক্ষ্মী কুমার চাকমা, গ্রাম উত্তর সার্বোয়াতলী

৯ পৃষ্ঠায়দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

সরকার জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে: সন্তু লারমা

'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম জোরদার করুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দু'একবার আয়োজন করা হলেও দীর্ঘ প্রায় চার দশকের পর এবারই প্রথম সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হলো। তাই এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে নিয়ে সমিতি ও সমিতির অঙ্গ সংগঠনের সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আগ্রহ ও উচ্ছাসের অন্ত ছিল না। তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চলসহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতির ৪১ বছরের দীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামে সমিতি ও সমিতির অঙ্গ সংগঠনের সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা নব উদ্যমে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটিতে গণসঙ্গীত, র‍্যালি ও গণসমাবেশের আয়োজন করে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে ও এর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিবৃতি, পোস্টার ও হ্যান্ডবিল প্রকাশ করা হয়। গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণঐক্য এর আহ্বায়ক ও বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ পংকজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ও সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, কমিউনিস্ট কেন্দ্র এর যুগ্ম আহ্বায়ক ডা: অসিত বরণ রায়, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজীব মীর, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি জড়িতা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক দপ্তরের স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা এবং সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতি পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা।

সমাবেশের শুরুতে প্রথমে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন

করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং কেন্দ্রীয় সদস্য লয়েল ডেভিড বম। পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সঙ্গীত ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। এরপরই সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ কর্তৃক বেলুন উড়িয়ে গণসমাবেশের উদ্বোধন করা হয়। এরপর জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতা এম এন লারমাসহ বীর শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট মৌনব্রত পালন করা হয়।

গণসমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন, 'পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগণের তাদের অস্তিত্ব, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য জনসংহতি সমিতি জন্ম লাভ করেছে এবং এই ৪১ বছরে লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের মধ্যে শুধু নয়, শুধু বাংলাদেশের আপামর জনগণের মধ্যে নয়, এই জনসংহতি সমিতি সারা বিশ্বে তার স্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। জনসংহতি সমিতির দীর্ঘ ৪১ বছরের সংগ্রামের ইতিহাসে যেমনি সফলতার দিক আছে, তেমনি বিফলতাও রয়ে গেছে।'

সরকারকে উদ্দেশ্য করে সন্তু লারমা বলেন, 'আজকে বর্তমান সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলেন, চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, অবশিষ্ট এক বছরের মধ্যে কয়েকটি মাস ইতোমধ্যে চলে গেল, কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই, বিগত চার বছরের মধ্যে এই শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য অঞ্চলের বুকে বারংবার জাতিগত সহিংসতা সংঘটিত করেছে। এই সরকার নতুন করে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় পার্বত্য অঞ্চলের বুকে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে, চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে, অন্যদিকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।... তাই আমি সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীকে হুশিয়ারি দিতে চাই, এই সরকার, এই দেশের শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে থাকে যে, পার্বত্য অঞ্চলে সাত লক্ষাধিক জুম্ম জনগণ তারা তাদের সংগ্রামের যে চেতনা সেটা হারিয়ে ফেলেছে, লড়াই সংগ্রামের দিক নির্দেশনা তারা ভুলে গেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পেছনে যে লড়াই-সংগ্রাম, সেই লড়াই-সংগ্রামের সমাধি দেয়া হয়েছে বলে ধারণা নিয়ে থাকেন এবং সেই ধারণা পোষণ করে যদি ক্রমাগত দমন-পীড়ন চালিয়ে যেতে থাকেন, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীলনক্সা যদি বাস্তবায়ন করে যান তাহলে আমি বলবো এই সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী ভুল করছেন, ভুল পথে পা রাখছেন।'

সন্তু লারমা জনসংহতি সমিতির দাবিসমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং দাবি উপেক্ষা করা হলে তা আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে জুম্ম যুব সমাজ ও জনগণ প্রস্তুত রয়েছে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সন্তু লারমা আরও বলেন, 'সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ঘুমিয়ে নেই। তারা জেগে উঠেছে। বেঁচে থাকার লড়াই-সংগ্রাম তারা শিখেছে।' তিনি বলেন, '৭২ সালে যেমন এদেশের আদিবাসী সমাজের দাবিকে উপেক্ষা করে বাঙালিকরণ শুরু করা হয়, সেটাই আবার নতুন করে বর্তমান সরকার করছে।' তিনি আরও বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে সরকার অনেক অনাচার করছে। অপারেশন উত্তরণের নাম দিয়ে সেনাশাসন বলবৎ রেখে আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চাইছে। ইসলামী সম্প্রসারণবাদের প্রকল্পটা এখনও অব্যাহত রাখা হয়েছে।' তিনি জনসংহতি সমিতির দাবিসমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং দাবি উপেক্ষা করা হলে তা আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে জুম্ম যুব সমাজ ও জনগণ প্রস্তুত রয়েছে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সমাবেশে পংকজ ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা চিরদিন সেনাকবলিত থাকতে পারে না। সেনাকবলিত হয়ে অধিকারহীন হয়ে থাকতে পারে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এটা জেনে রাখুন। বিশ্বের দরবারে আপনার মুখ উজ্জ্বল হবে না। আপনি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই চুক্তি ১৫ বছরেও বাস্তবায়ন হয় না। কোন হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষীও বলতে পারে না, আরও কয় বছর হলে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে।'

ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, 'জনসংহতি সমিতি যে দীর্ঘ সংগ্রাম করছে, এই দীর্ঘ সংগ্রামে আমরা সবসময় জনসংহতি সমিতিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে সমর্থন জানিয়েছি। যখন জনসংহতি সমিতি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, তখনও সেই সংগ্রামে সমর্থন জানাতে আমরা দ্বিধাবোধ করি নাই। যেদিন আপনারা অস্ত্র সমর্পণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন সেদিনও আমরা সমর্থন জানিয়েছিলাম। আজকে যখন আপনারা বলছেন যে, ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করুন। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাদের মোল্লাদের মত মানুষদের হুমকিতেই আজ শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কাদের মোল্লাদের ইচ্ছায় শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন বন্ধ রাখা যাবে না।'

ডা: অসিত বরণ রায় বলেন, 'ধর্ম পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু জাতীয়তা কোন দিন পরিবর্তন করা যায় না। জাতীয়তা তার রক্ত দিয়ে মিলিত থাকে, হাজার বছরের সংস্কৃতি দিয়ে সংরক্ষিত থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, তাহলে আমাদের দাবি মেনে নিতে হবে। এই দেশে এমন কোন আন্দোলন, সংগ্রাম বৃথা যায় নাই। আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে বলছি এই আন্দোলনও বৃথা যেতে দেব না।'

বিজয় কেতন চাকমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এমনি আসে নাই, সেই সামরিক জান্তা এরশাদ শাহী আরম্ভ করেছিল, বিএনপি অনেক বার সংলাপ করেছিল। আর চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ ওয়াদা করেছিল এই মেয়াদেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন। অথচ চার চারটি বছরের বেশি হয়ে গেল, এখনও আমরা চুক্তির মৌলিক দিকগুলো অবাস্তবায়িত দেখছি। এখনও এখানে আমাদের উপর সামরিক নির্যাতন চলছে। সেই সামরিক নির্যাতন থেকে আমরা কেন উদ্ধার হবো না?'

সঞ্জীব দ্রং বলেন, 'আদিবাসীদের সংগ্রাম কখনও শেষ হবে না। আপনাদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, আপনাদের বিজয় হবেই। কেউ আদিবাসী পাহাড়ী মানুষের জেগে উঠার এই চেতনাকে রোধ করতে পারবে না, স্তব্ধ করতে পারবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা যখন সাংবিধানিক স্বীকৃতির কথা বলি, ভূমি অধিকারের কথা বলি, তখন আমরা আমাদের দেশকে, মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা বলি। আমরা যখন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলি, নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলি, তখন আমরা সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের কথা বলি- এসবই আমাদের মানবাধিকার। আমাদের যে অধিকার তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার।'

রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, 'আমরা এদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি, আমরা মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছি, রক্ত দিয়েছি। কেউ যদি মনে করে, এই দেশ কেবল বাঙালিদের, আদিবাসীদের নয়- আমরা মানতে পারব না। তবে আমরা দেখছি, আদিবাসীদের কীভাবে ধ্বংস করা যায় সে ষড়যন্ত্র দু'শ বছর ধরে চলছে। সেই বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, স্বাধীনতার ৪১ বছরে আদিবাসীদেরকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের প্রতি নির্যাতন, নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। নারীদের উপর নানা রকম অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আমরা প্রতিনিয়ত তা অবলোকন করছি, আমরা এর ভুক্তভোগী।'

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক, উগ্রজাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। সামন্তশ্রেণী ও বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত নির্মম ও বর্বরোচিত দমন-পীড়নে জর্জরিত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধীরে ধীরে চরম অবলুপ্তির পথে ধাবিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় জুম্ম জনগণের প্রতি চরম বঞ্চনা, পাকিস্তান সৃষ্টির পর জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণের উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালের শাসনবিধি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মুসলমানদের বসতি প্রদান, ১৯৫৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়ন করে জুম্মদের ভূমি বেদখল এবং ১৯৬০ সালে জুম্ম জনগণের মরণ ফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ স্থাপনের মাধ্যমে জুম্মদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, ১৯৬৩ সালে ট্রাইবাল অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা একতরফাভাবে বিলুপ্তিকরণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের দ্বার উন্মুক্তকরণ, স্বাধীনতা লাভের পর রাজাকার-মুজাহিদ-মিজো দমনের নামে জুম্মদের উপর অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন, ১৯৭২ সালে জুম্ম জনগণের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান সর্বোপরি পঞ্চাশ দশকের শুরুতে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার হীন উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরকারী উদ্যোগে বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি প্রদান ইত্যাদি জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের একের পর এক ষড়যন্ত্রের ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। সমগ্র অঞ্চলে দেখা দেয় চরম অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা। জুম্ম জনগণ ঠিক এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দলের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করতে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুবক সমিতি (১৯১৫), পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি (১৯২০), পাহাড়ি ছাত্র সমিতি (১৯৫৬), পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি (১৯৬৬) সহ নানা সংগঠন গঠনের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের উপর চলমান শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে চেষ্টা করা হলেও এসব সংগঠন জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক দলের অভাব পূরণ করতে পারেনি। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের

৪৮ পৃষ্ঠায়দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

নীরবে চলছে শিশু পাচার ও ধর্মান্তরিতকরণ:

সম্প্রতি ঢাকার মাদ্রাসা থেকে আরও ১৬ আদিবাসী জুম্ম শিশু উদ্ধার

বেশ কিছু দিন ধরে ধর্ম ব্যবসায়ী একটি মহল আদিবাসীদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যকে পুঁজি করে আদিবাসী শিশু পাচার ও ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে আদিবাসী দালাল নিযুক্ত করার প্রমাণও পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিককালে পাচারের শিকার আদিবাসী শিশু উদ্ধার, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার ও সচেতন আদিবাসী ছাত্রদের তৎপরতার ফলে বিষয়টি প্রকাশ পায়।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি ২০১৩ পুলিশ কর্তৃক ঢাকার সবুজবাগ থানাধীন আবুজোর জিফারি মসজিদ কমপ্লেক্স নামক এক মাদ্রাসা থেকে ১৬ আদিবাসী জুম্ম শিশুকে উদ্ধার করা হয়। এই শিশুদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। ত্রিপুরা ও চাকমা জাতিভুক্ত এসব শিশুদের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতারণা করে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধারকৃত ১৬ জনের মধ্যে ঐদিনই ১১ জন শিশুকে মুচলেকা দিয়ে তাদের অভিভাবকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু অপর ৫ জন শিশুর অভিভাবক না আসায় পুলিশী হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু উক্ত ১১ জন শিশু অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের কিছু সময় পরই ঢাকা শহর থেকেই আবার হারিয়ে যায় বলে জানা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, দালালদের দ্বারা তাদেরকে আবার মাদ্রাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ১১ জনের মধ্যে ৯ জন ত্রিপুরা শিশু ও ২ জন চাকমা শিশু। জানা যায়, স্থানীয় দালালরা যারা ঐ শিশুদের ঢাকায় নিয়ে আসে তারাই আবার মাদ্রাসায় ফিরিয়ে নিতে অভিভাবকদের বাধ্য করেছে। উদ্ধার হওয়ার পর আবার হারিয়ে যাওয়া ১১ শিশুর পরিচয় হল-

(১) সুজন চাকমা, পিতা- বিন্দু লাল চাকমা, গ্রাম- চঙরাছড়ি, ফারুয়া ইউনিয়ন, বিলাইছড়ি উপজেলা;
(২) সোহেল চাকমা, পিতা ও ঠিকানা- ঐ;
(৩) সিমলা ত্রিপুরা (মেয়ে শিশু), পিতা- ওয়াকিয়া ত্রিপুরা, খুমবর্তি ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
(৪) পিটোর ত্রিপুরা, পিতা- অজ্ঞাত, ঠিকানা- ঐ;
(৫) কর্ণজয় ত্রিপুরা, পিতা- হামাজন ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
(৬) আব্রাহাম ত্রিপুরা, পিতা- মধুচন্দ্র ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
(৭) সেনিপতি ত্রিপুরা (মেয়ে শিশু), পিতা ও ঠিকানা- ঐ;
(৮) মায়ানি ত্রিপুরা (মেয়ে শিশু), পিতা- শুভমং ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
(৯) জুলিমা ত্রিপুরা (মেয়ে শিশু), পিতা ও ঠিকানা- ঐ;
(১০) দইকম ত্রিপুরা, পিতা ও ঠিকানা- ঐ;
(১১) শিগোরাম ত্রিপুরা, পিতা ও ঠিকানা- ঐ।

অপরদিকে উদ্ধার হওয়া অপর ৫ শিশুকে পুলিশী হেফাজতে রাখার পর ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৩ বরেন্দ্র লাল ত্রিপুরাসহ অভিভাবকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই ৫ শিশুর পরিচয় হল-

(১) সুমল ত্রিপুরা, পিতা- চান্দুলা ত্রিপুরা, গ্রাম- চঙরাছড়ি, ফারুয়া ইউনিয়ন, বিলাইছড়ি উপজেলা;
(২) সুনীলা ত্রিপুরা (মেয়ে শিশু), পিতা ও ঠিকানা- ঐ;
(৩) রেনী ত্রিপুরা (মেয়ে শিশু), পিতা- মৃত আনন্দ ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
(৪) রবিন ত্রিপুরা, পিতা- চান্দুলা ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
(৫) মতি ত্রিপুরা, পিতা- মৃত আনন্দ ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ।

শিশু পাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত বিনয় ত্রিপুরা

জানা যায়, উক্ত শিশুদের সংগ্রহ ও পাচারের ক্ষেত্রে বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের যে ৫ ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে দালাল হিসেবে কাজ করে তারা হল- (১) দীপক ত্রিপুরা, (২) হামাজন ত্রিপুরা, (৩) শুভমং ত্রিপরা, (৪) মধুচন্দ্র ত্রিপুরা ও (৫) বিন্দু লাল চাকমা। আর এই ৫ দালালকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে থাকে রাঙ্গামাটিস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও জামায়াতের নেতা মশিউর রহমান, ঢাকা কলেজের ছাত্র আশরাফ হোসেন ও ঢাকার মিরপুরস্থ আবুজোর জিফারি মাদ্রাসা। জানা যায়, এভাবে মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি থেকে আরও ১৩৮ জন ছাত্র, বান্দরবান থেকে ৪২ জন ও খাগড়াছড়ি থেকে ৬ জন ছাত্র অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছে।

উক্ত উদ্ধারকৃত ৫ ছাত্রের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, তারা চরম অভাবের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। প্রায় সময় তাদেরকে উপোসে রাত কাটাতে হয়। তাদের গ্রামে কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। উক্ত ৫ দালাল তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠানোর প্রস্তাব দিলে তারা রাজী হন। চুক্তি হিসেবে কিছু কাগজে তাদের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়, কিন্তু তারা জানে না সে কাগজে কী লেখা রয়েছে। এমনকি তারা জানত না যে তাদের শিশুদের কোথায়, কোন মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের জুলাই মাসেও গাজীপুর ও ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ১১ জন আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে গাজীপুর জেলার মিয়া পাড়ার দারুল হুদা ইসলামী মাদ্রাসা থেকে ৮ শিশুকে এবং ঢাকার মোহাম্মদপুরের এক মাদ্রাসা থেকে ১ নারী শিশু ও গুলশানের দারুল হুদা মাদ্রাসা থেকে ২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, ২০১২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মধ্যে বান্দরবান জেলাধীন থানচি, রুমা ও লামা উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসব শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়। আর এদের পাচারের ক্ষেত্রে দালালির ভূমিকা পালন করে বান্দরবান এলাকারই (১) এন্ড্রু ত্রিপুরা (১৮), (২) বড়মনি ত্রিপুরা ও (৩) নরবার্ট ত্রিপুরা। জানা যায়, এই দালালরা প্রত্যেক অভিভাবকের কাছ থেকে ৬ হাজার হতে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করে এই বলে যে, এই টাকা মিশনে দেয়া হবে এবং শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। অথচ শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন মাদ্রাসায়। ২০১২ সালের জুলাই মাসে উদ্ধারকৃত শিশুদের পরিচয় নিম্নরূপ-

(১) শান্তিচন্দ্র ত্রিপুরা (মো: আব্দুর রাহমান), পীং- রবিহান ত্রিপুরা, গ্রাম- সেফ্রু পাড়া, রুমা উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(২) ম্যাথ্যু ত্রিপুরা (মো: জসিম), পীং- কংশোহ্লা ত্রিপুরা, গ্রাম- বইথুনি পাড়া, রুমা উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(৩) জোসেফ ত্রিপুরা (মো: মাসুদ), পীং- নকুরাং ত্রিপুরা, গ্রাম- ইমাঝন, থানচি উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(৪) ডমিনিক ত্রিপুরা (মো: হাফিজ উদ্দিন), পীং- মাচন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম- দুর্যোধন পাড়া, লামা উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(৫) সাইমন ত্রিপুরা (মো: আবু হুরেরা), পীং- অতিজন ত্রিপুরা, গ্রাম- ইমানুয়েল পাড়া, টংকাবতী, বান্দরবান, বয়স ৯ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(৬) পিটার ত্রিপুরা (মো: বশির), পীং- রুমাজন ত্রিপুরা, গ্রাম- কিওমং হেডম্যান পাড়া, থানচি উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ৮ বছর, ২য় শ্রেণী;

(৭) রেশমাই ত্রিপুরা (আব্দুল্লাহ), পীং- চন্দ্রিয়ন ত্রিপুরা, গ্রাম- সেপ্রুপাড়া, বিলাইছড়ি, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(৮) জুয়েল ত্রিপুরা (আবু জাফর), পীং- অনন্ত ত্রিপুরা, গ্রাম- কিওমং হেডম্যান পাড়া, থানচি উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ৪র্থ শ্রেণী;

(৯) সান্তনা ত্রিপুরা (হালিমা বেগম), পীং- রুমাজন ত্রিপুরা, গ্রাম- কিওমং হেডম্যান পাড়া, থানচি উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১০ বছর, ২য় শ্রেণী;

(১০) রেমন্ড ত্রিপুরা (মো: আব্দুর রহিম), পীং- রাজবাহাদুর ত্রিপুরা, গ্রাম- বড়থলি পাড়া, রুমা উপজেলা, বান্দরবান, বয়স ১৩ বছর, ৬ষ্ঠ শ্রেণী;

(১১) সুশান্ত ত্রিপুরা (মো: আব্দুল বশির), পীং- অতিজন ত্রিপুরা, গ্রাম- ইমানুয়েল পাড়া, টংকাবতী, বান্দরবান, বয়স ১২ বছর, ৬ষ্ঠ শ্রেণী।

জানা যায়, আদিবাসীদের সাম্প্রতিক ধর্মান্তরকরণের এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ২০০৪ সালে। বিশেষ করে যারা অশিক্ষিত, প্রত্যন্ত এলাকার গরীব মানুষ, যেখানে গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব- সে সমস্ত এলাকাই এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। স্থানীয় বেকার আদিবাসী দালাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং তাদেরকে দিয়ে নানা প্রতারণামূলক কথা বলে, শিশুদের বিনা খরচে পড়ালেখা শেখানো হবে ইত্যাদি কথা বলে এসব শিশু সংগ্রহ করা হয় বলে জানা যায়।

সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের একতরফা ও বিতর্কিত উদ্যোগ

(২১ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে বলে জানা গেছে।

উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে একতরফা ও বির্তকিতভাবে যদি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধন করা হয় তাহলে প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রী মনোনীত প্রতিনিধিকে আহ্বায়ক করে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিকে অবজ্ঞা করা হবে এবং এই কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভার সিদ্ধান্তকে পদদলিত করা হবে। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিসহ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তও লঙ্ঘিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ইতিপূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কমিশনের কার্যাবলী ক্ষমতা (শর্তাংশ), সভার কোরাম ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে সংশোধন করা হলে আইনটি ত্রুটিপূর্ণভাবে সংশোধিত হবে এবং তাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি হবে। সচিবসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে একতরফা ও বিতর্কিতভাবে ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ ও উদ্বেগ জানিয়েছে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ও আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনতিবিলম্বে আইন সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মেলন ২০১৩ অনুষ্ঠিত

পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম সংস্কৃতিকে ধারণ করতে ও এগিয়ে নিতে হলে, প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বিধান করতে চাইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হতে হবে - সন্তু লারমা

'বৈচিত্র্যময় জুম্ম সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চাই' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১৬ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলা সদরস্থ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম দীর্ঘজীবী পথিকৃৎ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মেলন ২০১৩' অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে সত্তর দশকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত এই পুরোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় জড়িত সাংস্কৃতিক কর্মী, সংগঠক, শিল্পীসহ সংগঠনের শত শত সদস্য, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সমবেত হন।

দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা, কাউন্সিল অধিবেশন ও সমাপনী অধিবেশন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশনের পরপরই সম্মেলন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আনন্দ জ্যোতি চাকমা অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, অতিথিবৃন্দ ও সভাপতিকে মঞ্চে আসন গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং আসন গ্রহণের পর তাঁদেরকে উত্তরীয় পরানো হয়। এরপরই সম্মেলনের উদ্বোধক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি জয়তী চাকমা ইনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের উদ্বোধক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক, বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী রনজিত দেওয়ান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরূপা দেওয়ান, প্রবীন কণ্ঠশিল্পী জয়শ্রী রায়, বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার মনোজ বাহাদুর, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা শিল্পকলা একাডেমীর প্রাক্তন কালচারাল অফিসার মুজিবুল হক বুলবুল, বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটির সঙ্গীত প্রযোজক রণেশ্বর বড়ুয়া, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা। এছাড়া গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক আনন্দ জ্যোতি চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন তরুণ কণ্ঠশিল্পী চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা।

আলোচনা সভায় উদ্বোধক শ্রী লারমা বলেন, 'আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে যদি আমরা জুম্ম সংস্কৃতিকে ধারণ করতে চাই,

এগিয়ে নিতে চাই, এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বিধান করতে চাই, তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হতে হবে। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে গিরিসুরের মত আরও অনেক সুর মানুষের জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে সেই সুর হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে, বিকৃত হবে, অথবা সেই সুর অন্য সুরের সাথে মিশে যেতে বাধ্য হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই সরকার ও শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিকে চিরতরে বিলুপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। যদি তা না হতো, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি কেন বাস্তবায়িত হবে না? আজকে কেন পার্বত্য চট্টগ্রমের ১৫ জাতিগোষ্ঠীর তাদের যে জীবনধারা, সংস্কৃতি কেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। কেন তা শোষণ, দমন, নিপীড়নের মধ্য দিয়ে থাকতে বাধ্য হবে, কেন পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বিচরণের জন্য অপারেশন উত্তরণ নামক এক ধরনের সেনাশাসন থাকবে?...

তিনি আরো বলেন, আজকে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে শেখ হাসিনা সরকার যে সংশোধনী এনেছেন, সেখানে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের যারা নাগরিক তারা সবাই বাঙালি। তাহলে আজকে ত্রিপুরা, মারমা, খিয়াং, খুমি, গারো, সাওতাল.. ইত্যাদি কমপক্ষে ৫৪টি জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংস্কৃতি ও জীবনধারা এক কলমের খোঁচায় তথা সংবিধানের এক সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, '১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, 'উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।' প্রকৃতপক্ষে চুক্তির এই অনুচ্ছেদে যা বলা আছে, সেই অনুয়ায়ী কী আমরা সরকার তথা এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি? নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে, না। বরঞ্চ তাদের যে ভূমিকা দেখি সেটা নেতিবাচক। আজকে বাংলাদেশের সরকার, যে সরকার ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন, সেই সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারাও তাদের সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার জন্য, নিরাপদ করার জন্য সংগ্রাম-আন্দোলন করেছিলেন। আজকে সেই সরকার, সেই বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বাস্তবায়িত না করে তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সংস্কৃতিকে বিকশিত করার জন্য, নিরাপদ করার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল, সেটা সরকার বাস্তবায়ন করছে না। সরকার এখানে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, এদেশের শাসকগোষ্ঠী এক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।'

শ্রী লারমা আরও বলেন, 'আজকে কোন কিছু উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হলে, সেখানে অধিকারের প্রশ্নটি জড়িত থাকে। একজন মানুষের, একটা জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার যদি সমুন্নত না থাকে, তার কর্মের অধিকার, তার অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং তার সংস্কৃতি তথা জীবনের যে অধিকার, সে অধিকার যদি না থাকে, তাহলে সেখানে কীভাবে সংস্কৃতি বিকশিত হবে? সেখানে কীভাবে তার সংস্কৃতি স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে পারবে? আজকে আমাদের অধিকার নেই, আমরা আমাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে, একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে জীবন এগিয়ে যেতে পারে না। ...এখানে সরকার তিনটি জেলায় তিনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট করেছে, কিন্তু সেখানে কী চর্চা করা হয়? সেখানে বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি জীবনধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে থাকে। সেখানে আমাদের আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের অধিকারকে ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত করা হচ্ছে না বা সেভাবে কাজ করতে পারছে না।'

রনজিত দেওয়ান সত্তর দশকের প্রারম্ভে সৃষ্টি হওয়া ছাত্র আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, 'একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, পাহাড়ী ছাত্র সমিতির পতাকা তলে একমাত্র গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জোয়ার সৃষ্টি করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় আত্মপরিচয়ের জোয়ার উন্মোচন করে দিয়েছিল।' তিনি এও বলেন, 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি না হলে, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী না হলে রনজিত দেওয়ানের পরিচিতি লাভ সম্ভব হতো কী না শতভাগ সন্দেহ থেকে যায়।'

গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠালগ্নের অন্যতম শিল্পী নিরূপা দেওয়ান বলেন, 'সেই সময় রচিত হওয়া গানগুলো আমাদেরকে অনেক উজ্জীবিত করেছিল। সে সময় আন্দোলন-সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক সহযোগিতা করেছিল। আমার মনে আছে, আমরা যে গান গাইতাম, একদিন খবর আসলো, 'ঝিমিত ঝিমিত জুনি জ্বলে..' এই গানটি নাকি গাওয়া যাবে না, এই গানটা নাকি রাষ্ট্রদ্রোহীর পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা আরেকটা গান গাইতাম, 'রেত্তো জনমমো ন' থেব'... খুব সুন্দর একটা গান।'

গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর নতুন কমিটি গঠিত: বিকাল ৩:০০টায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন অধিবেশনে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ৯ সদস্য বিশিষ্ট এ নতুন কমিটিতে পুনরায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন জয়তী চাকমা ইনু, সহ-সভাপতি হিসেবে বাচ্চু চাকমা, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আনন্দ জ্যোতি চাকমা ও সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন বিজ্ঞান্তর তালুকদার। নতুন কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা।

বিশেষ প্রতিবেদন

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু, সংক্রান উৎসব উদযাপিত

চুক্তি বাস্তবায়নে এবং জুম্ম সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নেই- রাঙ্গামাটিতে সন্তু লারমা

২০১৩ সালের ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল, তিন দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু, সংক্রান যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষে প্রতিবারের ন্যায় এবারও তিন পার্বত্য জেলায় আলোচনা সভা ও র‍্যালিসহ নানা কর্মসূচি, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কমিটির ব্যানারে জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে এই উৎসব উদযাপনের নানা উদ্যোগ নেয়া হয়।

রাঙ্গামাটি : ৯ এপ্রিল 'আদিবাসী জুম্ম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশে ঐক্যবদ্ধ হোন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে আয়োজিত উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ক অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

উদ্বোধনী ভাষণে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন, 'সরকার মুখে অনেক কথা বললেও কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে তথা জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে কোন আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা দেখা যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে, তাদের সাংবিধানিক অধিকার, ভূমি ও অর্থনৈতিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার জন্য ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা সরকার যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করেছিল, আজকে সেই চুক্তি বাস্তবায়নেও সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর তাদের যে সংস্কৃতি তথা জীবনধারা সেটা উজ্জীবিত থাকবে, নাকি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই প্রশ্নের মুখোমুখী হয়ে আমরা এই উৎসব পালন করতে যাচ্ছি।'

সন্তু লারমা আরও বলেন, 'আজকে আমরা এমন এক বাস্তবতায় এই উৎসব পালন করছি, যখন জুম্মদের জাতীয় সংস্কৃতি পদদলিত। বর্তমান সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কমপক্ষে ৫৪টি আদিবাসী জাতির জাতীয় অস্তিত্ব অবলুপ্ত করে দিয়েছে। এই পঞ্চদশ সংশোধনীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের যারা বসবাস করে, যারা নাগরিক, তারা সবাই বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন। এর দ্বারা আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় স্বীকৃতি অবদমিত করা হয়েছে, পদদলিত করা হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এমন এক সময়ে এবারের এই বিজু উদযাপিত হচ্ছে যখন সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান, যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি আদিবাসী নরনারী নিরাপত্তাহীন জীবন নিয়ে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখনো জনসংহতি সমিতির ৫২ জন সদস্য ও সমর্থক ইউপিডিএফের নিকট জিম্মি হয়ে হয়েছে। তাদের পরিবারগুলো অপহৃতদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। আজকে সারাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আজকের দিনটিকে মর্যাদা দিয়ে যে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। তবে তার পাশাপাশি জুম্ম জাতির পক্ষ থেকে আমি এ উদ্বেগ জানাতে চাই, বিএনপি আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় নাই। তাই আজকে হরতাল প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহকে যে মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেছেন তার যথার্থ প্রতিফলনের জন্য আবারও আমি বিএনপিকে জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাই অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের এই জাতীয় উৎসবকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ঘোষণা দেবেন।'

অতিথির বক্তব্যে গৌতম দেওয়ান বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও তা শুধু জনসংহতি সমিতির চুক্তি নয়, তা বাস্তবায়ন করা শুধু জনসংহতি সমিতির দায়িত্ব নয়, পাহাড়ি-বাঙালি পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী যারা আছি তাদের সকলেরই এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যারা পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী আছি, আসুন অমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই, পরিস্থিতি মোকাবেলা করি এবং আমরা যদি সম্মিলিতভাবে শক্তির উৎস খুঁজে নিয়ে এগুতে পারি, তাহলে খুব বেশি দূরে নয় যে আমরা লক্ষে পৌঁছুতে পারবো।'

ড. মানিক লাল দেওয়ান বলেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এত বড় অনুষ্ঠানে দাবি করা হয়েছে যে, আদিবাসী জুম্ম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশে ঐক্যবদ্ধ হোন। আমি মনে করি, আমাদের দাবি কোন দিন বাস্তবায়িত হবে না, যতদিন পর্যন্ত আমরা একতাবদ্ধ হবো না।'

এছাড়া অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জগত জ্যোতি চাকমা, বিএনপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি দীপেন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উছিংচা রাখাইন কায়েস, এ্যাডভোকেট সুদীপ তঞ্চঙ্গ্যা, অনুপম খিয়াং, মনু মরমু প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শরৎ জ্যোতি চাকমা ও নিশি দেওয়ান।

বান্দরবান : অন্যান্য পার্বত্য জেলার ন্যায় বান্দরবানেও জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রামে এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ১৩, ১৪ ও ১৫ এপ্রিল তিন দিনব্যাপী এইসব অনুষ্ঠানমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে র‍্যালি, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পানি উৎসব।

খাগড়াছড়ি : এই উৎসব উপলক্ষে ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল চার দিনব্যাপী আলোচনা সভা, র‍্যালি ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদও এই উৎসবে সামিল হয় এবং বিভিন্ন সংগঠন ও সম্প্রদায় নিজেদের উদ্যোগে নানাভাবে এই উৎসব উদযাপন করার চেষ্টা করে। এ বছর ইউপিডিএফ ঐতিহ্যবাহী জাতীয় উৎসবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের লক্ষ্যে তথাকথিত ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের ইস্যু তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালায়। জনমত বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা নানা নামে তথাকথিত ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখার নীতি পরিত্যাগ করা এবং আলোচনার টেবিলে আসার আহ্বান জানায়। উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ক্ষেত্র মোহন রোয়াজা ও সদস্য সচিব দীপায়ন চাকমা স্বাক্ষরিত ৮ এপ্রিল প্রচারিত এক প্রেস ব্রিফিং-এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনসংহতি সমিতিকে এ আহ্বান জানানো হয়। অথচ সংঘাতের সূত্রপাতকারী ও মূল হোতা ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের ব্যাপারে তেমন কোন কিছুই বলা হয়নি। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসহ স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন কথাই উল্লেখ করা হয়নি। আজকে চুক্তি বিরোধিতার নামে যারা সংঘাত সৃষ্টি করে চলেছে এবং চুক্তির মধ্য দিয়ে স্বীকৃত জুম্ম জনগণের অধিকারকে নস্যাৎ করার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে একটি বাক্যও সেখানে স্থান পায়নি।

বৈসাবি প্রসঙ্গ: বিভিন্ন জাতীয় প্রচার মাধ্যম, সরকারী কার্যালয়, সংগঠন ও গোষ্ঠী এই বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু উৎসবকে বৈসাবি বা বৈসাবী উৎসব বলে অপপ্রচার করে থাকে। অনেক প্রচার মাধ্যম ও ব্যক্তি এই ব্যাপারটির তাৎপর্য না বুঝে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত যত্রতত্র বৈসাবি ব্যবহার করে চলেছে, যার কোন বাস্তবতা বা যৌক্তিকতা নেই। লক্ষণীয় যে, চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফও এই উৎসবের প্রকৃত নামকে গৌণ করে বৈসাবি নামটিই অধিক ব্যবহার করে। দেখা গেল, এবারও প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকাস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতিসহ রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে কেউ কেউ এ উৎসবকে 'বৈসাবি' হিসেবে অভিহিত করে, তেমনি বিভিন্ন কমিটির নামও দিয়েছে সেই অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন জনগোষ্ঠী 'বৈসাবি' নামের কোন উৎসব পালন করে থাকে না অথবা কোন জনগোষ্ঠীর ভাষায় এই শব্দটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাস্তবে 'বৈসাবি' বলতে কোন উৎসবের অস্তিত্বই পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই। বলাবাহুল্য, চাকমাদের ভাষায় 'বিজু', মারমা ও চাকদের ভাষায় 'সাংগ্রাই', ত্রিপুরাদের ভাষায় 'বৈসুক' তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় 'বিষু', গুর্খা ও অহমিয়াদের ভাষায় 'বিহু', ম্রোদের ভাষায় 'সাংক্রান' ও খুমীদের ভাষায় 'সাংক্রাই' এই উৎসবের নামের সাথে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এসব ঐতিহ্যবাহী ও অর্থপূর্ণ বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু, সাংক্রাই ইত্যাদি প্রকৃত নামের বিকৃতকরণ কখনোই সুবিবেচনাপ্রসূত হতে পারে না। এ ব্যাপারে

৯ পৃষ্ঠায়দেখুন

জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা, যৌন হররানি, ধর্ষণ ও হত্যা

জুরাছড়িতে বখাটে যুবক কর্তৃক ধষণের শিকার এক নারী শিশু

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় ১২ বছরের এক আদিবাসী নারী শিশু ৬ জন বখাটে জুম্ম যুবক কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণকারীদের মধ্যে ৫ জনের নাম হল– অমিয় চাকমা (২৩), রয় চাকমা (২৩), প্রমোদ চাকমা (১৮), সুখীরায় চাকমা (২৩), বাতুল চাকমা (১৮)। অপরজনের নাম জানা যায়নি।

জানা যায়, ঐদিন রাতে ছিল জুরাছড়ি এলাকাস্থ সুবলং শাখা বনবিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবের প্রথম দিন। রাত প্রায় ১০:০০ টায় উক্ত শিশুটি বান্ধবীসহ বিহারে যাওয়ার পথে উক্ত বখাটে যুবকরা জোর করে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এর কিছুক্ষণ পর ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন শিশুটিকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে। ধর্ষিতা শিশুটির বাবা বাদী হয়ে জুরাছড়ি থানায় উক্ত যুবকদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। কিন্তু আসামীদের কাউকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানা যায়।

রাঙ্গামাটি শহরে এক বখাটে যুবক কর্তৃক জুম্ম কিশোরী ধর্ষণের শিকার, ধর্ষক গ্রেফতার

গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলা সদর এলাকার রিজার্ভ বাজারস্থ এক হোটেলে রমেশ ত্রিপুরা (৩৬) পীং- বীর কিশোর ত্রিপুরা, ঠিকানা- গর্জনতলী, রাঙ্গামাটি পৌরসভা নামের এক বখাটে জুম্ম যুবক কর্তৃক এক আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়।

জানা যায়, ঐ দিনই এই কিশোরী তার দুই মামাত ভাইয়ের সঙ্গে বাঘাইছড়ি থেকে রাঙ্গামাটিস্থ রাজবন বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসবে যোগ দিতে রাঙ্গামাটি আসে। শহরে তেমন কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় না থাকায় তারা সন্ধ্যার দিকে রিজার্ভ বাজার এলাকার আলআমিন বোর্ডিং-এ উঠে। তারা যে কক্ষ ভাড়া নেয়, সেই কক্ষের পাশে থাকত রমেশ ত্রিপুরা। পরে রাত্রে রমেশ ত্রিপুরা পুলিশ আসার কথা বলে কিশোরীকে কক্ষ খুলতে বাধ্য করে এবং বাইরে নিয়ে আসে। এ সময় রমেশ ত্রিপুরা কিশোরীর মামাত ভাইদের বাইরে থেকে কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখে এবং কিশোরীটিকে পার্শ্ববর্তী শ্যামলজ হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরদিন বেলা ১১:০০ টার দিকে কিশোরীটিকে ছেড়ে দেয় রমেশ ত্রিপুরা। ঘটনাটি জানাজানি হলে, ২২ নভেম্বর ২০১২ সকালের দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে রিজার্ভ বাজারের শুটকিপট্টি এলাকা থেকে ধর্ষণের অভিযোগে রমেশ ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় রমেশ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে বলে জানা যায়।

কাউখালীতে এক মারমা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন, একজন গ্রেফতার

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ৪ নং কলমপতি ইউনিয়নের বড়ডলু গ্রামে তুমাচিং মারমা (১৪) পিতা: মৃত সুইথুইপ্রু মারমা নামের এক মারমা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। নিহত তুমাচিং মারমা কাউখালী গার্লস স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

জানা যায়, গত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে তুমাচিং মারমা গরু আনার জন্য বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকায় যায়। কিন্তু সন্ধ্যা নামার পরও সেখান থেকে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মেয়েটির মায়ের বড় বোনের স্বামী নাইলাছড়ি সেটেলার এলাকার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে বিবস্ত্র অবস্থায় তুমাচিং মারমার লাশ দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দেয়া হলে লাশটি উদ্ধার করা হয়। লাশের গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় বলে জানা যায়। পরিবার ও এলাকাবাসীর অভিযোগ, মেয়েটিকে একা পেয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। পরদিন সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে গত ৬ জানুয়ারি ২০১৩ পুলিশ তুমাচিং মারমা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত অপরাধীদের মধ্যে মো: আলাউদ্দিন পীং- মৃত মফিজুর রহমান নামের এক সেটেলার যুবককে গ্রেফতার করে। জানা যায়, এই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তার তিন সঙ্গী মো: সেলিম খান, মো: দিদার পীং- বাদাম সওদাগর ও জনৈক সাহাবুদ্দিন এর এক ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই ঐ জঙ্গলে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে যেত। অভিযোগ রয়েছে, এই ঘটনার কয়েক মাস আগেও এই গ্রেফতারকৃত মো: আলাউদ্দিন ঐ জঙ্গলে একা পেয়ে অপর এক আদিবাসী মারমা মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল। ঐ ঘটনাটি তখন স্থানীয় জনগণের মধ্যস্থতায় ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ধামাচাপা দেয়া হয়। প্রতিবেশী পাহাড়িদের ধারণা, স্থানীয় মারমা গ্রামবাসীদের জায়গা বেদখলের ষড়যন্ত্র ও পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য থেকেই এসব সেটেলার যুবকরা এ ধরনের নানা অপরাধ ও হয়রানি সংঘটিত করে আসছে।

উল্লেখ্য, তুমাচিং মারমার মামা চাইথোয়াই প্রু মারমা প্রথমে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কাউখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইসামং মারমা থানায় উক্ত সেটেলার যুবকদের নাম পেশ করেন। এদের মধ্যে আলাউদ্দিন গ্রেফতার হলেও বাকী তিনজনকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। অপরদিকে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী জামিনে আলাউদ্দিনকে মুক্ত করার লক্ষে তৎপর রয়েছে বলে জানা গেছে।

সাভারে একজন আদিবাসী চাকমা কণ্যাশিশু অপহরণ, পরে উদ্ধার

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৩ আশুলিয়ার বুড়ির বাজার এলাকার মোহর আলীর বাড়ির ভাড়াটিয়া ১৪ বছরের এক আদিবাসী চাকমা কিশোরীকে তৌফিক ইসলাম নামে এক ব্যক্তি অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে তাকে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে ধর্ষণ করে। এদিকে পরিবারের লোকজন ওই কিশোরীকে খোঁজাখুজি করেও না পেয়ে ওই দিন রাতেই আশুলিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। এরপরও মেয়ের কোনো খোঁজ না পেয়ে ওই কিশোরীর বাবা গত মঙ্গলবার দুপুরে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পর ওই রাতেই পুলিশ আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকার পবনার টেকে অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এ সময় পুলিশ ধর্ষক তৌফিক ইসলামকেও গ্রেফতার করেছে।

ধর্ষকদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে আহুত শান্তিপূর্ণ হরতাল কর্মসূচিতে বান্দরবানে পুলিশের লাঠিচার্জ

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন' দেশব্যাপী নারীর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে এবং তুমাচিং মারমার হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে তিন পার্বত্য জেলায় অর্ধ দিবস হরতালের ডাক দেয়। হরতাল চলাকালে সকাল প্রায় ১০:০০ টায় পুলিশ বান্দরবানের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রতিবাদকারীদের উপর লাটিচার্জ করে। এতে বেশ কয়েকজন প্রতিবাদকারী মারাত্মকভাবে আহত হয়।

শান্তিপূর্ণ হরতাল চলাকালে পুলিশের লাঠিচার্জে আহতদের মধ্যে রয়েছেন– দুর্বার নারী নেটওয়ার্কের প্রাক্তন সভাপতি শাহানা বেগম, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ডনাইপ্রু নেলী, বাংলাদেশ ত্রিপুরা ক্রিশ্চিয়ান স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের বান্দরবান শাখার সভাপতি অমৃতা ত্রিপুরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জর্জ কলিং ত্রিপুরা ও সভাপতি জর্জ ত্রিপুরা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের বড়দুলু পাড়ায় দুর্বৃত্ত কর্তৃক তুমাচিং মারমাকে (১৪) ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন' গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে এবং উক্ত অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়।

বান্দরবানে বাঙালি যুবক কর্তৃক এক মারমা কলেজ ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বান্দরবান জেলাধীন বান্দরবান পৌরসভার বালাঘাটা বাজার এলাকায় তিন বাঙালি যুবক কর্তৃক এক আদিবাসী মারমা কলেজ ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হয়।

জানা যায়, ঐ দিন বান্দরবান মহিলা কলেজের আবাসিক ছাত্রী হোস্টেলের দ্বিতীয় বর্ষের ঐ ছাত্রী কেনাকাটার জন্য বালাঘাটা বাজারে গেলে মো: ইমরান, তার বন্ধু হামিদ ও অপর এক যুবক কর্তৃক এই যৌন হয়রানির শিকার হন। ইতিপূর্বেও ঐ যুবকরা এই ছাত্রীকে হয়রানি ও হুমকি প্রদান করে। ছাত্রীটি ইতোমধ্যে প্রথমে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও পরে পুলিশকে ঘটনাটি বিষয়ে অবহিত করে।

কলেজের এক কর্মচারী নাইশেমং মারমা ও স্থানীয় দোকানদার লিয়াকত উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানা যায়। ঘটনার সময় নাইশেমং ও লিয়াকত উক্ত দুর্বৃত্তদের থামানোর চেষ্টা করলেও দূর্বৃত্তরা তাতে ভ্রুক্ষেপ করেনি। উল্টো তারা নাইশেমং মারমার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা যায়, দুর্বৃত্ত ইমরান স্থানীয় বাঙালি যুব পরিষদের একজন সদস্য। ঘটনার পরপরই ইমরান ও তার বন্ধুরা গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু ব াঙালি ছাত্র পরিষদ উক্ত ইমরানসহ দু'জনকে উজি হেডম্যান পাড়া থেকে অপহরণ করা হয়েছে এবং অপহরণকারীরা দু' লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে বলে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে। এমনকি বাঙালি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান বাজার মসজিদ প্রাঙ্গণে এই সাজানো অপহরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশও করে। অন্যদিকে ইমরানসহ বাঙালি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা ছাত্রীটিকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়।

বাঙালি যুবক কর্তৃক এক আদিবাসী ত্রিপুরা ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার

গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বান্দরবান জেলার বান্দরবান পৌরসভা এলাকাধীন মিলনছড়ি রিসোর্ট এলাকায় মো: সালমান, পীং- মো: হারুন নামের এক যুবক কর্তৃক এক আদিবাসী ত্রিপুরা কলেজ ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হন। ধর্ষণ ও হত্যার শিকার তমাচিং মারমার হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে ঐদিন আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে এই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঐ ছাত্রী ঐদিন কলেজে ক্লাস শেষে বান্দরবান পৌরসভাধীন সাইঙ্গা ত্রিপুরা পাড়ায় বাড়িতে ফিরছিল। বিকাল আনুমানিক ৪:০০ টায় সে যখন বান্দরবান-থানচি সড়ক সংলগ্ন মিলনছড়ি রিসোর্ট এলাকায় পৌঁছে তখনই প্রাইভেট রিসোর্টের কর্মী

মো: সালমান হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে। তবে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং পালিয়ে চলে আসে। ঐ ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটি পৌর কমিশনার হাবিবুর রহমান ও স্থানীয় ইউপি সদস্য জগদীশ ত্রিপুরাকে অবহিত করে বলে জানা যায়। ঘটনার পর থেকে মো: সালমান পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে জানা যায়।

সাজেকে এক আদিবাসী জুম্ম কিশোরী ধর্ষণের শিকার

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের নাক্সাছড়ি গ্রামে জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৩ বছর বয়সী এক আদিবাসী চাকমা কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়।

জানা যায়, ঐ দিন বিকাল প্রায় ৩:০০ টায় ঐ কিশোরী বাড়ির পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ফুলঝাঁড়ু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বের হয়। এ সময় বাঘাইছড়ি বাজার এলাকার মো: মামুন (২১) পীং- জলিল নামের এক সেটেলার যুবক এই চাকমা কিশোরীকে একা পেয়ে জোর করে রাস্তার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। পরে গ্রামবাসীরা জঙ্গল থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে। তবে উদ্ধারের সময় ধর্ষণকারী মামুনকে তারা চিনতে পারলেও মোটর সাইকেলে সে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ায় আটক করতে ব্যর্থ হয়।

এ ব্যাপারে বাঘাইছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৪, তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। পুলিশ অপরাধী মামুনকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে ধর্ষণের শিকার কিশোরীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য রাঙ্গামাটি নিয়ে গিয়ে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জানা গেছে, ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে।

রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার জঙ্গল থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় এক মারমা কিশোরীকে উদ্ধার

গত ২ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি পৌরসভা এলাকাধীন খেপ্যাপাড়া-আসামবস্তি সেতু সংলগ্ন এক জঙ্গল থেকে মুমূর্ষ অবস্থায় এক আদিবাসী মারমা কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জানা গেছে, এই মারমা কিশোরী রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার বাসিন্দা।

উদ্ধারকৃত ঐ কিশোরী জানায় যে, তিন বাঙালি ছাত্রী তাকে রাউজানের একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে কিছু হালকা নাস্তা খাওয়ার পর ঐ তিন বাঙালি ছাত্রীসহ তারা একটি অটোরিক্সায়

উঠে। এরপরই ঐ মারমা কিশোরীটি অচেতন হয়ে পড়ে। পরে সে চেতনা ফিরে পায় এবং একজন সরকারী চাকুরীজীবিসহ দুই বাঙালি যুবকের পাশে জঙ্গলে নিজেকে খুঁজে পায়। এরপরই ঐ দুই বাঙালি যুবক তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে, কিন্তু সে কোনমতে পালাতে সক্ষম হয়। এরপর সে পার্শ্ববর্তী এক বাঙালি গ্রামবাসীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই গ্রামবাসী তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। এর কয়েক মিনিট পর সে আবার অচেতন হয়ে পড়ে। এরপর কী হয়েছে সে আর জানে না।

মাটিরাঙ্গায় স্বামীর নির্যাতনে এক শিক্ষিকার মৃত্যু

গত ৯ মার্চ ২০১৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার মংতু চৌধুরী পাড়া এলাকায় ক্র্যাউরী মারমা (২৬) নামের এক শিক্ষিকা তার স্বামীর বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ক্র্যাউরী মারমা হারুন হেডম্যান পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

জানা যায়, ঐ দিন সন্ধ্যা প্রায় ৭:০০ টায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে শিক্ষিকার স্বামী খাগড়াছড়িস্থ ইউএনডিপি কার্যালয়ের ড্রাইভার লেব্রেচাই মারমা তার স্ত্রীর তলপেটে নির্মমভাবে উপর্যুপরি লাথি ও ঘুষি মারে। এতে পেটে ও শরীরের অন্যান্য অংশে মারাত্মক যন্ত্রণা শুরু হয়। এক পর্যায়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় গুরুতর অবস্থায় তাকে মাটিরাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপরই সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরদিন বিকাল ৬:০০ টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই তার মৃত্যু ঘটে।

রাঙ্গামাটির জীবতলিতে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে স্কুল শিক্ষক গ্রেফতার

গত ২১ মার্চ ২০১৩ পুলিশ ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন জীবতলি চেয়ারম্যান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অরূপ কুমার মুৎসুদ্দিকে রাঙ্গামাটি শহর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। জানা যায়, বেশ কিছু দিন ধরে অভিভাবক ও ভুক্তভোগী ছাত্রীদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছিল যে, প্রায় ৭-৮ মাস ধরে ঐ শিক্ষক ৫/৬ জন ছাত্রীকে নানাভাবে যৌন নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি স্কুল পরিচালনা কমিটি ব্যাপারটি অবগত হওয়ার পর যাচাই করতে শুরু করলে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়। স্কুল পরিচালনা কমিটির আহূত এক সভায় অনেক ছাত্র/ছাত্রী ঐ শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন হয়রানি চালানোর ঘটনা তুলে ধরে। এরপর ব্লাস্টের সহযোগিতায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর আওতায় রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানায় ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে উক্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় জনগণ উক্ত শিক্ষককে অবিলম্বে তার চাকরী থেকে বরখাস্তের দাবি জানিয়ে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করে।

রামগড়ে সেটেলার কিশোরের ধর্ষণের শিকার এক মারমা নারী শিশু

গত ২৬ মার্চ ২০১৩ খাগড়াছড়ির জেলার রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নে মো: বেলাল হোসেন নামের সপ্তম শ্রেণীর এক বাঙালি সেটেলার ছাত্র কর্তৃক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া আদিবাসী এক মারমা কণ্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ দিন সকাল আনুমানিক ৮:০০টায় হাফছড়ি ইউনিয়নের কালাপানি পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ৮ বছরের কন্যাশিশু, তৃতীয় শ্রেণীর এই মারমা ছাত্রী বাড়িরই পার্শ্ববর্তী হাফছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দেয়। স্কুলে যাবার পথে একা পেয়েই পার্শ্ববর্তী সেটেলার এলাকার বাসিন্দা নুরুল ইসলামের ছেলে, জালিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মো: বেলাল হোসেন (১৫) এই মারমা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। জানা যায়, স্কুলের অনতিদূরেই মারমা ছাত্রীটির বাড়ি হলেও ধর্ষণ ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। পরে অভিভাবকরা বাড়িতে এসে এই ধর্ষিতা শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তার কাছ থেকেই ঘটনা ও ধর্ষণকারীর বিষয়ে জানতে পারে। এরপরই শিশুটিকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় গুইমারা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়েছে বলে জানা গেছে এবং পুলিশ ধর্ষণকারী মো: বেলাল হোসেনকেও গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় এক জুম্ম কিশোরী ধর্ষণের শিকার

গত ৪ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ২:০০-৩:০০ টায় চট্টগ্রাম জেলাধীন সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাট নামক এলাকায় ফোরকান নামের এক ট্রাক ড্রাইভার কর্তৃক ১২ বছরের এক ত্রিপুরা জুম্ম কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়।

জানা যায়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বাইল্যাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা ঐ জুম্ম কিশোরী বেশ কিছু দিন আগে সাতকানিয়ার কেরানীহাটে তার নিকটাত্মীয় স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারী পিন্টু ত্রিপুরার বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করার জন্য এসেছিল। ঐ দিন রাত্রে ঐ কিশোরী যখন ঘুমুচ্ছিল, তখন তার শোয়ার ঘরে জানালায় থাকা একটি ছিদ্র দিয়ে পানি ছুটে এসে গায়ে লাগলে সে জেগে উঠে এবং কী হতে পারে ভেবে সে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে চলে আসে। এমন সময় ট্রাক ড্রাইভার ফোরকান তার মুখ চেপে ধরে পার্শ্ববর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। কিছুক্ষণ পর বাড়ির লোকজন জেগে উঠে দরজা খোলা দেখলে এবং মেয়েকে না দেখতে পেয়ে মনে সন্দেহ জাগলে তারা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এক পর্যায়ে পার্শ্ববতী স্থানে প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় মেয়েটিকে খুঁজে পায়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা যায়। তবে পুলিশ ধর্ষণকারীকে এখনও গ্রেফতার করেছে বলে জানা যায়নি।

দীঘিনালায় ৮ বছরের আদিবাসী শিশুকন্যা খুন

গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ দুপুরের দিকে খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়স্থ রাঙ্গাপানিছড়া গ্রামের রোক্কেয়্যা চাকমার ৮ বছর বয়সী শিশু চম্পা চাকমা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে তরকারী সংগ্রহ করতে গিয়ে হত্যার শিকার হয়। চম্পা চাকমা দক্ষিণ রাঙ্গাপানিছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী বলে জানা যায়। জানা যায় যে, বড়পেদা চাকমা নামে রাঙ্গাপানিছড়া গ্রামের চার বছর বয়সী বাক-প্রতিবন্ধী এক শিশুসহ চম্পা চাকমা তরকারী সংগ্রহ করতে যায়। বিকালে ঐ বাক-প্রতিবন্ধী শিশুটি বাড়িতে ফিরে আসলেও চম্পা ফিরে না আসায় সারারাত খোঁজাখুজি করেও আত্মীয়-স্বজনরা উদ্ধার করতে পারেনি। তারপরদিন খোঁজাখুজির একপর্যায়ে বিকাল বেলায় জঙ্গলে চম্পা চাকমার লাশ উদ্ধার করে। তার মাথার পিছনে দু' জায়গায় জখম রয়েছে বলে জানা যায়। দীঘিনালা থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে সেদিন খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

(৬০ পৃষ্ঠা পর)

কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত রাখা; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা যথাযথ ব্যবস্থার দাবিতে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

বাচ্চু চাকমার পরিচালনায় উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি রননজয় চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মাইকেল চাকমা। উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা আর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুখালী মৌজার হেডম্যান অরুনময় চাকমা, পিসিপির সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা রিমিতা চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি রিন্টু চাকমা।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন স্থগিত রাখা; তিন পার্বত্য জেলার সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষকদের আবাসন ও পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা; রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান কলেজে অধিকসংখ্যক বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালুকরণসহ শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা; দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজগুলোতে আদিবাসী জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর কোটা সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণাসহ উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা; এবং তিন পার্বত্য জেলার সদরে তিনটি প্যারা-মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও পলিটেকনিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা ইত্যাদি ৫ দফা দাবিনামা তুলে ধরা হয়।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফের এক বাঙালি শ্রমিককে গুলি করে হত্যার ঘটনার জেরে

মাটিরাঙ্গায় জুম্ম গ্রামে সেটেলার বাঙালিদের হামলা, ৩৬টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুঠপাট

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৫:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১৮৮ নং খেদাছড়া মৌজার বটতলী ব্রিক ফিল্ডে গিয়ে ইউপিডিএফ এবং সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের যৌথ উদ্যোগে ব্রিকফিল্ডের শ্রসিকদেরকে অপহরণ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ফারুক হোসেন (১৯) নামের এক শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং ম্যানেজার আবুল হোসেন ও শ্রমিক শাহজাহান নামের দুই বাঙালি গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনায় সংস্কারপন্থী হুক্রে চাকমা ওরফে বিশাল, গ্রাম- বাবুপাড়া, বাঘাইছড়ি সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এবং ইউপিডিএফ এর অমর জ্যোতি চাকমা ওরফে শ্রাবণ এর নেতৃত্বে ৭ জনের সশস্ত্র সদস্য অংশ গ্রহণ করে বলে জানা যায়।

এদিকে হতাহতের ঘটনা জানাজানি হলে পার্শ্ববর্তী সেটেলার বাঙালি পাড়া থেকে ভিডিপি আমীর হেসেন, মানিক মিয়া, লিটন, সুমন এর নেতৃত্বে প্রায় অর্ধ শতাধিক সেটেলার বাঙালি ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ১৮৮ নং হেদাছড়া মৌজা ও বেলছড়ি ইউনিয়নের হেমাঙ্গ কার্বারী পাড়া ও রবিধন কার্বারী পাড়ার উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ২ পাহাড়ি গ্রামবাসীর বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং ৩৬ টি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুঠপাট করে নিয়ে যায়। আগুনে পুড়ে যাওয়া এবং লুঠপাট হওয়া বাড়িঘরের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল-

যাদের বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়-

১। বিজয় ত্রিপুরা (৬৫) পিতা- মৃত পূর্ণজয় ত্রিপুরা, গ্রাম- হেমাঙ্গ কার্বারী পাড়া, হেদাছড়া মৌজা
২। অংলা মারমা (৬০) পিতা- চাংউ মারমা, গ্রাম- রবিধন মগ পাড়া, হেদাছড়া মৌজা

যাদের বাড়িঘরের উপর ভাংচুর ও লুঠপাট হয় তাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মানিকধন ত্রিপুরা (৩০) পিতা- মৃত পূর্ণজয় ত্রিপুরা, গ্রাম- হেমাঙ্গ কার্বারী পাড়া, হেদাছড়া মৌজা
২। পূর্ণ মোহন ত্রিপুরা (৫০) পিতা- মৃত চন্দ্র কুমার ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
৩। ধন বাঁশী ত্রিপুরা (৩৫) পিতা- রাজ কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম- যুদ্ধ কুমার পাড়া, হেদাছড়া মৌজা
৪। যোগ্য মোহন ত্রিপুরা (৩০) পিতা- হেমাঙ্গ মোহন ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
৫। হিরেন্দ্র ত্রিপুরা (৩০) পিতা- নিলেন্দ্র ত্রিপুরা, ঠিকানা- ঐ;
৬। কিরণ মারমা (৩৫) পিতা- উথাই মারমা, গ্রাম- রবিধন মগ পাড়া, হেদাছড়া মৌজা
৭। চাইহ্লা প্রু মারমা (৩৮) পিতা- উথাই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৮। চালা অং মারমা (৩৫) পিতা- থোয়াইঅং মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৯। বাদু মারমা কার্বারী (৬৫) পিতা- হুলা অঙ মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১০। রাংলাউ মারমা (৩৮) পিতা- থোয়াই চাই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১১। খেজর মারমা(৩৫) পিতা- জাইমা মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১২। থোইচ অঙ মারমা, (৩০) পিতা- অংচাথোয়াই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৩। বংজা মারমা (৩২) পিতা- চাইহ্লা প্রু মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৪। রাপ্রু মারমা (৩৫) পিতা- চাইহ্লা প্রু মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৫। চাথোয়াই অং মারমা (৪০) পিতা- চাইউ মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৬। মার্জি মারমা (৫০) পিতা- চাইউ মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৭। থোইউ মারমা (৩৫) পিতা- চাথোয়াই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৮। পাইতাউ মারমা (৩০) পিতা- উথুই অং মারমা, ঠিকানা- ঐ;
১৯। পাইলাউ মারমা (৩৫) পিতা- উখৈই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২০। অংচাই মারমা (৩৫) পিতা- চাইহ্লা প্রু মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২১। পাইলু মারমা (২৫) পিতা- চাথোয়াই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২২। স্রারুংচুংমা মারমা (৪৫) স্বামী চাথোয়াই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২৩। মিয়াং প্রু মারমা (৫০) পিতা- থোয়াচাই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২৪। বুলি মারমা (৫৫) পিতা- চালাঅং মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২৫। থোয়াইচঙ মারমা (৭০) পিতা- মৃত মিলাঅং মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২৬। অংগ্য চাই মারমা (৩৫) পিতা- থোইলা প্রু মারমা, গ্রাম- রবিধন মগ পাড়া, ১৮৮ নং হেদাছড়া মৌজা, ৫ নং বেলছড়ি ইউনিয়ন, উপজেলা- মাটিরাঙ্গা, জেলা- রাঙ্গামাটি;
২৭। দোমা মারমা (৬০) স্বামী- অংচাই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২৮। খেয়া মারমা, (৩৮) পিতা- চাথোয়াই অং মারমা, ঠিকানা- ঐ;
২৯। উহ্লা প্রু মারমা (৩০) পিতা- মিয়ং মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩০। মিলা মারমা, (৩৫) পিতা- চাইলাপ্রু মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩১। মংচাথোয়াই মারমা (৩৭) পিতা- উথোয়াই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩২। নিউ মারমা (৩৮) পিতা- মংচাথোয়াই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩৩। চলাপ্র মারমা,(৩৫) পিতা- মংহ্লাপ্রু মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩৪। মংথোয়াই মারমা (৪০) পিতা- আথুই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩৫। মিয়ং মারমা (৩৫) পিতা- মংসানাই মারমা, ঠিকানা- ঐ;
৩৬। লিউঅং মারমা (৪০) পিতা- চাইহ্লা প্রু মারমা, ঠিকানা- ঐ।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের চাঁদাবাজির জেরে

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালিদের হামলায় চার জুম্ম গ্রামবাসী আহত

গত ৫ এপ্রিল ২০১৩ ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বরনাল ইউনিয়নের প্রাণ কুমার কার্বারী পাড়ায় সেটেলার বাঙালিদের হামলায় চারজন জুম্ম গ্রামবাসী গুরুতর আহত হন বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঐদিন রাত আনুমানিক ১২.০০ টার দিকে জীবন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী এবং

বিকো ত্রিপুরা, রিপন ও অজয় চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীদের আরেকটি দল যৌথভাবে বরনাল ইউনিয়নের সেটেলার বাঙালি গ্রামে জোরপূর্বক চাঁদাবাজি করতে অভিযান চালায়। সেটেলার বাঙালিরা প্রতিরোধ করলে সন্ত্রাসীরা দু' রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেটেলার বাঙালিরা জুম্ম অধ্যুষিত প্রাণ কুমার কার্বারী পাড়ায় হামলা চালায়। এ হামলায় চারজন জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয় এবং সেটেলার বাঙালিরা একজন আহত গ্রামবাসী থেকে একটি মোবাইল সেটও কেড়ে নিয়ে যায়। আহতরা হলেন জবিন্দ্র ত্রিপুরার তিন ছেলে ধন কুমার ত্রিপুরা (৩৭), কাঠারাম ত্রিপুরা (৩২) ও তপন ত্রিপুরা (২৭) এবং ধন কুমার ত্রিপুরার ছেলে খাম্বা রায় ত্রিপুরা (২১)। সেটেলার বাঙালিদের হামলায় ভয়ে জুম্ম গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় বলে জানা যায়।

লামায় ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে জুম্মদের উপর বাঙালিদের হামলা: সেনাবাহিনী কর্তৃক ২ জন জুম্ম গ্রেফতার

গত ১৩ এপ্রিল ২০১৩ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা সদরের ছোট ননার বিল এলাকায় ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে পাহাড়িদের উপর বাঙালিদের এক হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় ১৪ জন আহত হয়েছে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক ২ জন জুম্ম গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায় যে, থুইনুমং মারমা তার পিতার নামীয় জায়গায় উপর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে গেলে আবদুল ওহাব ও আবুল খায়ের এর লোকজন বাঁধা প্রদান করেন। এ বিষয়ে থুইনুমং মারমা লামা থানায় ১৩ এপ্রিল সকালে একটি সাধারণ ডায়েরী করেন (ডায়রী নং ৫০১, তাং- ১৩/০৪/১৩)। ডায়রী করার পর জমিতে গিয়ে তারা দেখতে পান বিবাদী পক্ষ আবদুল ওহাব ও আবুল খায়ের গং তাদের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলছে। এ সময় তাদের বাঁধা দিলে এলাকার মহিলাসহ কতিপয় লোক থুইনুমং মারমাদের উপর উপর হামলা করে। এ ঘটনায় থুইমং মারমা (২৯) পীং তুজাথৈ মারমা ও নেপা মারমা (২৭) পীং ক্যজসিং মারমাসহ উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১৪ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। সেটেলার বাঙালিরা লামা সেনা সাব-জোনাধীন চম্পাতলী ক্যাম্পে অভিযোগ করলে সেদিন বিকাল ৩:৩০ ঘটিকার দিকে উক্ত ক্যাম্পের ৩০ বেঙ্গলের জনৈক মেজর কামরুলের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য ননার বিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে থুইমং মারমা ও নেপা মারমাকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে সারারাত রেখে তারপর দিন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জিম্মায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

আরো জানা যায় যে, আবদুল ওহাব নোয়াখালীর জেলার একজন বাসিন্দা। ওয়াপদার চাকরী সূত্রে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় বদলি হয়ে আসলে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে 'আর' কবুলিয়তের জমি ক্রয় করেন। ক্রয়সূত্রে 'আর' কবুলিয়তের জমি হিসেবে তিনি থুইনুমং মারমার পিতার নামীয় জায়গাও দাবি করে আসছে। এ নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে।

ভূমিদস্যুদের হয়রানিতে নাইক্ষ্যংছড়ির পাদুঝিরি চাক পাড়া থেকে উচ্ছেদ হয়েছে আদিবাসীরা

আরো ৫টি আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদের মুখে

বহিরাগত ভূমিদস্যুদের উৎপাত, হয়রানি ও হুমকির মুখে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের আলিক্ষ্যং মৌজার পাদুঝিরি চাক পাড়া নামে একটি আদিবাসী গ্রাম থেকে আদিবাসী গ্রামবাসীরা উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। এই গ্রামের ২১টি আদিবাসী চাক পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে অনিশ্চিতভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। এসব উচ্ছেদ হওয়া চাক পরিবারসমূহ অধিকাংশই জুমচাষী বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, রাবার কোম্পানী, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানী, মৌলবাদী জঙ্গী গোষ্ঠীসহ প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের লেলিয়ে দেয়া ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের চুরি, ডাকাতি, হয়রানিসহ নানা উৎপাত সহ্য করতে না পেরে চাকদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব 'সাংগ্রাই'-এর ২/৩ দিন আগে (২০১৩ সালের ৯/১০ এপ্রিলের দিকে) চাক গ্রামবাসীরা তাদের পাদুঝিরি পাড়া ছেড়ে কিছু পরিবার বাইশারী উপর পাড়ার বৌদ্ধ বিহারের জায়গায় এবং কিছু পরিবার বাইশারী হেডম্যান পাড়ায় অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

জানা যায় যে, উক্ত পাদুঝিরি চাক পাড়ার গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি দখলের উদ্দেশ্যে বহিরাগত বাঙালি ভূমিদস্যুরা চাক গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়। গ্রাম থেকে বাজারে আসা-যাওয়ার পথে ভূমিদস্যুদের লেলিয়ে দেয়া এসব সন্ত্রাসী ও শ্রমিকরা চাক গ্রামবাসীদের ডাকাতি ও মারধর করে। তারা পথে-ঘাটে গ্রামের আদিবাসী নারীদের উত্যক্ত ও যৌন হয়রানি করার চেষ্টা করে। সন্ত্রাসীরা প্রায় সময় চাক গ্রামবাসীদের জুমের ফসল ও বাগান-বাগিচা নষ্ট করে দেয়। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে চাক গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। আরো জানা যায় যে, প্রায় পাঁচ বছর আগেও এভাবে ভূমিদস্যুদের উৎপাতে বাধ্য হয়ে বাইশারী ইউনিয়েনের লংগদু চাক পাড়া থেকে আদিবাসীরা উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। এছাড়া গত বছর ২০১২ সালে লামা উপজেলার ফাস্যাখালী ইউনিয়নের আমতলীর পাড়ার ১৩ আদিবাসী ম্রো পরিবার ভূমিদস্যুদের হয়রানি সহ্য করতে না পেরে তাদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমানে আরো অন্তত পাঁচটি গ্রামের আদিবাসীরা যেমন- বাইশারী ত্রিপুরা গ্রামের ১৫ পরিবার, তৈনঝিরি চাক পাড়ার ১০ পরিবার, কামিছড়া চাক পাড়ার ১৫ পরিবার, পাইচাং ত্রিপুরা পাড়ার ১৫ পরিবার ও ক্রোক্ষ্যং চাক পাড়ার ২৫ পরিবার আদিবাসী গ্রামবাসী উচ্ছেদের মুখে রয়েছে। বিশেষ করে বাইশারী ত্রিপুরা গ্রামের ১৫ পরিবার গ্রামবাসীরা যে কোন সময় উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

উলেখ্য যে, বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি ও লামা উপজেলায় বিভিন্ন কোম্পানী ও বহিরাগত ব্যবসায়ী ব্যক্তি হাজার হাজার একরের রাবার বাগান গড়ে তুলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আদিবাসী জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালি অধিবাসীদের ভোগদখলীয় ও রেকর্ডীয়

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন

‘খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা’ এর পরিবর্তে ‘খাগড়াছড়ি’ লেখার এক নির্দেশনা, প্রতিবাদের মুখে পরে প্রত্যাহার

সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সহকারী কমিশনার (গোপনীয় শাখা) অঞ্জন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক পত্রে ‘খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা’ এর পরিবর্তে ‘খাগড়াছড়ি’ ব্যবহার/লেখার এক নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। গত ১ নভেম্বর ২০১২ তারিখ স্বাক্ষরিত উক্ত পত্রে ‘বিষয়: জেলার নাম শুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ প্রসঙ্গে’ উল্লেখ করে বলা হয় যে, ‘উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রজ্ঞাপন নং- এমইআর/জেএ১১/৭৬/৮৩-৩৪৮, তারিখ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৩ খ্রি: মোতাবেক ‘খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা’ এর পরিবর্তে সরকারী সবক্ষেত্রে ‘খাগড়াছড়ি’ ব্যবহার/লেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।’

গত ১৮ নভেম্বর ২০১৩ সজীব চাকমা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন থেকে জারীকৃত উক্ত নির্দেশনা সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন ও চুক্তি অনুসারে প্রণীত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ লঙ্ঘন বলে প্রতিবাদ করে। উক্ত আইনে স্পষ্টভাবে ‘খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা’ উল্লেখ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সামরিক শাসনামলে জারীকৃত নোটিফিকেশন এমইআর/জেএ১১/৭৬/৮৩-৩৪৮, তারিখ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৩ মূলে রামগড় মহকুমার রামগড় সদর, মাটিরাঙ্গা, মহালছড়ি, দীঘিনালা, মানিকছড়ি ও পানছড়ি উপজেলা নিয়ে ১ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়ি নামে একটা নতুন জেলা গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পরবর্তীতে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে খাগড়াছড়ি জেলার নাম খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা নামে পরিবর্তন করা হয়েছে।

সুতরাং বিদ্যমান আইনকে লঙ্ঘন করে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক এধরনের নোটিফিকেশন জারী করা বিধিসম্মত হতে পারে না। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত উক্ত নির্দেশনা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জনসংহতি সমিতি উল্লেখ করে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক বাহক ‘পার্বত্য জেলা’ শব্দসমূহ বাদ দেয়ার প্রচেষ্টাকে এই অঞ্চলের বৈশিষ্টপূর্ণ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার উপর আঘাত হানার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উল্লেখ করে। জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদের মুখে পরে উক্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হয়।

বালুখালিতে সেনা ও ইউপিডিএফ এর যৌথ তল্লাশীর শিকার জুম্ম গ্রাম, ২ বাড়ি তছনছ

গত ১৪ নভেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙা ইউনিয়নস্থ খারিক্ষ্যং সেনাক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সহায়তায় একই উপজেলার বালুখালি ইউনিয়নাধীন কান্দবছড়া নামক জুম্ম গ্রামে তল্লাশী অভিযান চালায়। এই অভিযানে দু’টি বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্রও তছনছ করা হয়।

জানা যায়, ঐ দিন দুপুর প্রায় ১:০০ টায় উক্ত ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন পাহারাত ও সুবেদার জয়নালের নেতৃত্বে ২৪ বেঙ্গল সেনাবাহিনীর একটি দল এবং রূপায়ণ চাকমা (২১) ঠিকানা- মাস্যাপাড়া, বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন ও শান্ত চাকমা (২২), ঠিকানা- ভুরবান্যা, বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন নামের ইউপিডিএফ এর দুই চিহ্নিত সন্ত্রাসী বালুখালির কান্দবছড়া গ্রামে আসে এবং গ্রামে তল্লাশী চালায়। এ সময় সেনা ও ইউপিডিএফের সদস্যরা জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য বলরাম চাকমা (৪৭) ও সোনারতন চাকমা (৪৮) নামের এক গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশী চালায়। এ সময় তারা উক্ত বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করে ও আসবাবপত্র ভেঙে দেয়। তল্লাশীর সময় বলরাম চাকমা ও সোনারতন চাকমা বাড়ির বাইরে অবস্থান করছিল। সেনা সদস্যরা ঐ বাড়ির নারী সদস্যদের সন্ত্রাসীদের খাবার ও আশ্রয় দেয় বলে অভিযোগ করে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ নিতে বলে।

এক পর্যায়ে বিকাল প্রায় ৫:০০ টায় সেনা ও ইউপিডিএফের সদস্যরা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

শুভলং বাজার থেকে এক চুক্তি সমর্থককে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক

রাঙামাটি’র বরকল উপজেলার শুভলং বাজারে গত ২০ মার্চ ২০১৩ দুপুর ২:০০ টার দিকে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা চুক্তিপক্ষের লোকদের ব্যাপক ধর-পাকড় চালায় বলে জানা গেছে। বেশ ক’জনকে আটক করার পর সবাইকে ছেড়ে দিলেও দিগন্ত চাকমা (২৮) নামক স্থানীয় একজন নিরীহ লোককে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক করে। উল্লেখ্য, জরুরি অবস্থার সময়ে শুভলং বাজারে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সেখানে আস্তানা গড়ে তুলে।

দীর্ঘদিন ধরে তারা সেখানে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে রাঙামাটি জেলায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী অপতৎপরতা

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক বিআরডিবির এক নিরীহ মাঠ পরিদর্শককে গুলি করে হত্যা

গত ১৮ নভেম্বর ২০১২ সকাল সাড়ে ৮টায় মানিকছড়ি থেকে মোটরসাইকেল যোগে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলায় যাওয়ার পথে রাঙাপানি নামক স্থানে বিআরডিবি'র মাঠ পরিদর্শক আলোবরণ চাকমা (৩৫) পিতা সুমতি চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। এ সময় তার স্ত্রী সুজাতা চাকমার (৩২) ডান হাতেও গুলিবিদ্ধ হয়। তিনিও একই প্রতিষ্ঠানে মাষ্টাররোলে চাকুরি করছেন। আহত অবস্থায় তাকে মানিকছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, পার্বত্য চট্টাগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী রতন বসু, রঞ্জন মেম্বার, অংপ্রুসি মারমা ও কেমব্রা মারমা ওরফে কেহ্লাচিং মারমার নেতৃত্বে ১০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ এ হামলা চালায়। নিহতের বাড়ি পানছড়ি উপজেলার লোগাং এর বাবুর পাড়া গ্রামে। পরিবারসহ মানিকছড়ি উপজেলার টিএন্ডটি এলাকায় তিনি বসবাস করছিলেন। সেদিন সকালে প্রতিদিনের মতো তিনি মোটরসাইকেল যোগে স্ত্রীসহ অফিসে যাচ্ছিলেন। পথে ওৎপেতে থাকা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ জন করাতকল শ্রমিক অপহৃত

গত ৩ ডিসেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাঙ্গামাটি শহরের বনরূপার সমতাঘাট এলাকার একটি করাতকল থেকে মিলের একজন ব্যাপস্থাপকসহ তিন বাঙালি শ্রমিককে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে। জানা যায় যে, ঘটনার সময় একটি ইঞ্জিনচালিত দেশীয় নৌকায় করে সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত ইউপিডিএফের ১০/১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সমতাঘাটের স'মিল ও প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে হানা দিয়ে অস্ত্রের মুখে তাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতরা হল– প্লাইউড ফ্যাক্টফরির ম্যানেজার মো. মাহবুব (৭০), স' মিলের শ্রমিক জুলফিকার আলী ভুট্টো, মো. বাঁচা মিয়া ও নুর মোহাম্মদ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময়ে অপহরণকারীরা ছয়/সাতটি ফাঁকা গুলি ছুড়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়। যাবার সময় ঘাটে থাকার একটি ইঞ্জিনচালিত বোটে সন্ত্রাসীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর জলযানঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে ও ঘটনার সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায়, সর্বোপরি প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী থেকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ না নেয়ায় এ অপহরণ ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। লোকজন দিগবিদিক ছুটে পালাতে থাকে। জানা যায়, পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক বাঙালি ব্যবসায়ী অপহৃত

জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা

খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলার ৩নং বড়নাল ইউনিয়নের তৈলাইফাং এলাকায় গত ২২ ডিসেম্বর ২০১২ বিকাল ৪ ঘটিকার সময় ইউপিডিএফের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এক তামাক ব্যবসায়ী সেটেলার বাঙালিকে অপহরণ করে। অপরদিকে এ ঘটনার অজুহাতে সম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে সেটেলার বাঙালিরা আদিবাসী জুম্মদের দুটি গ্রামে হামলার চেষ্টা চালায়। এসব আতঙ্কিত আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসী ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

পরে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি শান্ত রাখার চেষ্টা করে এবং অপহৃত ঐ ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইউপিডিএফের সাথে যোগাযোগ করে। পরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যা ৬:০০টার দিকে ঐ তামাক ব্যবসায়ীকে মুক্তি দেয়। তবে এসময় তার কাছ থেকে নগদ ৫০০০ টাকা ও ১টি মোবাইল সেট কেড়ে নিয়ে যায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। অপহৃত ওই তামাক ব্যবসায়ীর নাম মো: শাহজাহান, পিতা: চাঁন মিয়া, আমিন সর্দ্দার পাড়া, ৩নং বড়নাল ইউনিয়ন, মাটিরাঙা,খাগড়াছড়ি। জানা গেছে, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে দীর্ঘ দিন ধরে চাঁদা দাবি করে আসছিল।

মাটিরাঙ্গা উপজেলায় অপহরণ, চাঁদাবাজি, হত্যা, গুম, মুক্তিপণ আদায়সহ সন্ত্রাসের মূলহোতা ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা হল– (১) সঞ্জীব চাকমা, তাইন্দং বগা পাড়া, মাটিরাঙ্গা; (২) নতুন কুমার ত্রিপুরা, পিতা: মৃত পূর্ণ কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম: গোলাপ কার্বারী পাড়া, গোমতি ইউপি, মাটিরাঙ্গা; (৩) ধনমনি ত্রিপুরা, পিতা: মৃত ভরত কুমার ত্রিপুরা, গোমতি ইউপি, মাটিরাঙ্গা; (৪) জনলাল ত্রিপুরা, পিতা: মৃত অনঙ্গ মোহন ত্রিপুরা, গ্রাম: সর্বসিদ্দিপাড়া, মাটিরাঙ্গা এবং (৫) পঞ্চসেন ত্রিপুরা, পিতা: কুকসেন ত্রিপুরা, বেলছড়ি ইউপি, মাটিরাঙ্গা।

ইউপিডিএফ কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় এককালীন চাঁদা উত্তোলন

সম্প্রতি ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে তাদের যেখানে সন্ত্রাসী তৎপরতা বলবৎ রয়েছে সে সব এলাকায় তহবিল সংগ্রহের নামে অবাধে, ব্যাপকহারে চাঁদাবাজি চালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এমনকী গ্রামের দিনমজুরও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তাদের এই যখন তখন, অবিবেচক চাঁদা নির্ধারণের কবলে পড়ে সংশ্লিষ্ট জনগণ চরম ত্যক্ত-বিরক্ত ও আর্থিকভাবে চরম হয়রানিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মোতাবেক এর সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের কাছ থেকে অধিক হারে মাসিক, বাৎসরিক চাঁদা

ছাড়াও এককালিন চাঁদা আদায় করে চলেছে বলে বিভিন্ন এলাকার ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

জানা যায়, গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ মাটিরাঙ্গা উপজেলার তৈলাফাং মৌজাস্থ সুরেন্দ্র হেডম্যান পাড়ার তথাকথিত গ্রাম কমিটির সভাপতি মিলন কান্তি ত্রিপুরার নিকট সে এলাকার ইউপিডিএফ কালেক্টর নতুন কুমার ত্রিপুরা জনসাধারণের নিকট হতে এককালীন চাঁদা আদায়ের তালিকা প্রদান করে। একই তারিখে উক্ত উপজেলার আলুটিলা পুনর্বাসন গ্রামে ইউপিডিএফ-এর সহকারী কালেক্টর জিকো ত্রিপুরাও মাটিরাঙ্গা উপজেলার অন্যান্য সকল মৌজা হেডম্যান/কার্বারীদের নিয়ে এক সভা করে। ঐ সভায় প্রত্যেক মৌজার জনসাধারণের নিকট হতে এককালীন চাঁদা আদায় করে দিতে প্রত্যেক হেডম্যানকে দায়িত্ব দেয় এবং প্রত্যেক হেডম্যানকে এককালীন চাঁদা আদায়ের তালিকা প্রদান করে। অথচ এলাকাবাসীরা ফি-বছর সংস্কারপন্থী এবং ইউপিডিএফকে নিয়মিত বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এলাকাবাসীদের অনেক আপত্তির মুখে কালেক্টররা শেষ পর্যন্ত বলে দেয় যে, তালিকানুসারে অতি সহসা এককালীন চাঁদা আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং তাই করে দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়ে যায়। এককালীন চাঁদার পরিমাণ হচ্ছে- প্রত্যেক হেডম্যান থেকে ১,৫০০-২,০০০ টাকা, প্রত্যেক কার্বারী থেকে ১,০০০ টাকা, প্রত্যেক সচ্ছল পরিবার থেকে ১,৫০০ টাকা, প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ৫০০ টাকা ও প্রত্যেক দিন মজুর পরিবার থেকে ২০০ টাকা।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য অপহৃত ও হত্যা

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৩ আনুমানিক সন্ধ্যা ৭:০০ টায় ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলার পৌরসভা এলাকাধীন খবঙপয্যা গ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য সুনেন্দু বিকাশ চাকমা রেনন (৫৫) পীং- বিপিন চন্দ্র চাকমাকে অপহরণ করে। উল্লেখ্য, সুনেন্দু বিকাশ চাকমা রেনন ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন এবং এরপর আর সক্রিয় কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হননি।

সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে অপহরণের পর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সেসময় সুনেন্দু বিকাশ চাকমার স্ত্রী ও বোনকে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং মুক্তিপণ প্রদান করলে ছেড়ে দেয়া হবে বলে জানায়। মোবাইলে সুনেন্দু বিকাশ চাকমার সাথে তার বোনকে কথা বলতেও দেয়া হয় যাতে আত্মীয়রা বিশ্বাস করে সুনেন্দু বিকাশ বেঁচে আছে। বেঁচে আছে নিশ্চিত হওয়ার পর পরই সুনেন্দু বিকাশ চাকমার আত্মীয়রা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের নগদ ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে। কিন্তু মুক্তিপণ প্রদানের পর পরই সুনেন্দু বিকাশ চাকমার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে দেয়ার জন্য তার আত্মীয়দের জানিয়ে দেয় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। এভাবেই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে জনে ও ধনে ক্ষতি করে। এই হচ্ছে ইউপিডিএফের মনুষ্যত্বহীন নৃশংসতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

মাটিরাঙ্গায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের অপহরণের শিকার এক জুম্ম হেডম্যান

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টায় রূপায়ণ-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বামে গোমতী মৌজার হেডম্যান মনুলাল ত্রিপুরা (৩৫) পীং- মৃত মহন্ত কুমার ত্রিপুরাকে তার নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা হেডম্যান মনুলাল ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, সে সংস্কারপন্থী দলকে সহযোগিতা করে না। পরে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক হেডম্যানের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের অপহরণের শিকার জনসংহতি সমিতির সদস্য চিরঞ্জীব

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৪:০০ টায় ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার বড়গ্রামের বাসিন্দা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য চিরঞ্জীব ত্রিপুরা ওরফে স্বপন (৪৫) পীং- ইন্দ্র কুমার ত্রিপুরাকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জনগণের চাপের মুখে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে সন্ত্রাসীরা চিরঞ্জীব ত্রিপুরার কাছ থেকে জোরপূর্বক মুচলেকা নেয় বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের শিকার এক কার্বারী

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার মধ্যছড়া গ্রামের কার্বারী (গ্রাম প্রধান) সুনীল বিকাশ ত্রিপুরা (৪৫) পীং- মৃত অতিকায় ত্রিপুরাকে অমানবিকভাবে বেদম প্রহার করে। সন্ত্রাসীদের অভিযোগ হচ্ছে, কার্বারী সুনীল বিকাশ ত্রিপুরা ইতোমধ্যে ইউপিডিএফ কর্তৃক আহূত সভায় যোগদান করেনি।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান অপহৃত

গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর ২ টায় ইউপিডিএফের ৭/৮ জনের একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান স্বপন চাকমা, পীং তবল কুমার চাকমাকে তার নিজ বাড়ি তুংতুল্যাপাড়া থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে জানা যায়। ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফের কী অভিযোগ তা জানা যায়নি। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

সুবলঙে চাঁদা না দেয়ার অভিযোগে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ১২ নারী অপহরণের শিকার

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ বিকাল প্রায় ৫:০০ টায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ-এর চিহ্নিত সন্ত্রাসী বর্মা ও জাগরণ চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন শুভলং ইউনিয়নের দীঘলছড়ি এলাকায় হানা দিয়ে চাঁদা না দেয়ার অভিযোগ তুলে অস্ত্রের মুখে ১২ জন জুম্ম নারীকে অপহরণ করেছে।

জানা যায়, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ইতোমধ্যে দীঘলছড়ি গ্রামবাসীদের নিকট থেকে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা নির্ধারিত সময়ে এই চাঁদা দিতে ব্যর্থ হয়। এরপর ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা উক্ত তারিখে তাদের ৪০/৪৫ জনের জন্য ভাত ও তরকারী রান্না করে দীঘলছড়ি হাই স্কুলে এনে দেয়ার নির্দেশ দেয়। তাদের নির্দেশমত গ্রামের নারীরা রান্না করা ভাত ও তরকারী নিয়ে দীঘলছড়ি হাই স্কুলে পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত বর্মা চাকমা ও জাগরণ চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা তাদের ধার্যকৃত চাঁদা দেয়া হয়নি বলে অস্ত্রের মুখে দীঘলছড়ি গ্রামে ১২ জন নারীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃত ১২ জনের মধ্যে যে ৮ জনের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা হল–

(১) মমতা রানী চাকমা (৩০), স্বামী- সুমতি চাকমা;
(২) লেক্কাপুদি চাকমা (২৫), স্বামী- সুমন্ত চাকমা;
(৩) মায়াসোনা চাকমা (৩০), স্বামী- সুনিল চাকমা;
(৪) নিকা চাকমা (৩৩), স্বামী- নীতিময় চাকমা;
(৫) নয়না চাকমা (২২), স্বামী- জীবন চাকমা;
(৬) সুন্দরী চাকমা (৫০), স্বামী- হেগেরা চাকমা;
(৭) সুজাতা চাকমা (২০), পিতা- কমলেন্দু চাকমা;
(৮) ফুলরানী চাকমা (২৫), স্বামী- মঙ্গল কান্তি চাকমা।

জানা যায়, অপহরণের সময় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা অন্যান্য নারী ও শিশুদের উপরও নির্যাতন চালায়। তাছাড়া যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা বাড়ি-ঘরে ব্যাপক লুঠপাট চালায় এবং পক্ক চাকমা নামে এক গ্রামবাসীর বাড়ি থেকে ১ মণ চাউল নিয়ে যায়। এদিকে ঘটনাটি ব্যাপকভাবে জানাজানি হলে পরে ঐ দিনই রাত প্রায় ১০:০০ টায় দু' দিনের মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেয়া হবে মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দিয়ে অপহৃত নারীদের ছেড়ে দেয়া হয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৬ গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফকে সহযোগিতার নির্দেশ, অন্যথায় কঠিন পরিণতির হুমকি

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মাটিরাঙ্গা উপজেলার ৬ নিরীহ গ্রামবাসীকে খাগড়াছড়ি জেলা সদরস্থ গিরিফুল নামক স্থানে ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়। উক্ত ৬ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ে উপস্থিত হলে তারা ইউপিডিএফকে সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ করা হয়। এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফকে সহযোগিতা করার জন্য ঐ ৬ গ্রামবাসীকে নির্দেশ দেয় এবং সহযোগিতা না দিলে তাদেরকে কঠিন পরিণতির মুখোমুখী হতে হবে বলে হুমকি দেয়। হুমকির শিকার ৬ গ্রামবাসী হল–

১) নকুলছা ত্রিপুরা (৩৫) পীং- প্রহলাদ কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম- ছত্রগণ কার্বারী পাড়া, আমতলী ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা;
২) একতারা ত্রিপুরা (৫০) পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম- সুরেন্দ্র হেডম্যান পাড়া, ৩ নং বরনাল ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা;
৩) সাম কুমার ত্রিপুরা, (৪০) পিতা- মৃত হন্টাছা ত্রিপুরা, গ্রাম- সুরেন্দ্র হেডম্যান পাড়া, ৩ নং বরনাল ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা;
৪) সুনীল বিকাশ ত্রিপুরা, (৪৫) পিতা- মৃত অতিকায় ত্রিপুরা, গ্রাম- ময়দাছড়া, আমতলী ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা;
৫) বারু কুমার ত্রিপুরা. (৪০) পিতা- মৃত তিনশ কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম- অনন্ত কুমার কার্বারী পাড়া, আমতলী ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা;
৬) মন্টু ত্রিপুরা (৩৫) পিতা- করসিং ত্রিপুরা, ৩ নং বরনাল ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা।

জানা যায়, উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সুনীল বিকাশ ত্রিপুরা গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ নিজ বাড়িতে সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের দ্বারা বেদম প্রহারে গুরুতর আহত হন।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণের শিকার ২ নিরীহ মোটর সাইকেল আরোহী

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার মরাটিলা নামক এলাকায় ধর্মেন্দু চাকমা (২৮) পীং- জ্ঞান বিকাশ চাকমা, ঠিকানা- সান্তালপাড়া, পানছড়ি ও সাহদাত হোসেন (৩০) পীং- আমীর হোসনে, ঠিকানা- পানছড়ি উপজেলা সদর নামের ২ নিরীহ মোটর সাইকেল আরোহীর উপর এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। এতে দু'জনেই আহত হন এবং পার্শ্ববর্তী ঝর্ণাটিলা বিজিবি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাদেরকে পানছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

দীঘিনালায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ বিকাল প্রায় ৩:০০ টায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন মেরুং ইউনিয়নের শিমুলতলি গ্রামের বাসিন্দা মরতস' চাকমা (২৮) পীং- রাজমোহন বৈদ্য নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, অপহরণকারীদের মধ্যে চিহ্নিত তিনজন হল- (১) প্রদীপ চাকমা (৪৫) ঠিকানা- লেমুছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি জেলা, (২) সুগত চাকমা (৩৫), ঠিকানা- ঐ ও (৩) স্মৃতিবিন্দু চাকমা রাসেল (৩৬), ঠিকানা- এগারাল্যাছড়া, নানিয়ারচর উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা। জানা যায়, অপহরণকারীরা অপহৃত মরতস' চাকমাকে অমানবিকভাবে মারধর করে মারাত্মকভাবে আহত করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

দীঘিনালায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক নিরীহ এক গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২১ জানুয়ারি ২০১৩ বিকাল বেলায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের গবছড়ি গ্রামের বাসিন্দা জয় প্রসাদ চাকমা (৪১) পিতা- দিয়ান চাকমা স্থানীয় দাঙ্গা বাজারে যায়। সেখান থেকে দুপুর ২:০০ টার দিকে সংস্কারপন্থীদের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে মুক্তির ব্যাপারে সংস্কারপন্থীদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে ধরার বিষয় জানতে চাইলে, সে নাকি চুক্তি পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে বলে সংস্কারপন্থীরা জানায়। এব্যাপারে এলাকার মরুব্বীদের ধারণা, গ্রামবাসীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া জয় প্রসাদ চাকমা সে এলাকায় ইতোমধ্যে গাছবাগান বিক্রয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। মুরুব্বীরা যোগাযোগ করতে গেলে সংস্কারপন্থীরা তাঁর কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা দাবি করে বলে জানা যায়।

বাঘাইছড়ির সাজেকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১:০০ টার দিকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ববিন্দ কার্বারী পাড়ার দুই গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃত দু'জনকে অমানবিকভাবে মারধর করার পর ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ গুরুতর আহত অবস্থায় রাত আনুমানিক ১১.০০টার দিকে ছেড়ে দেয়। আর অপহৃত দু'জনের ছেলেও নাকি চুক্তি পক্ষের কর্মী বলে অভিযোগ করে ইউপিডিএফ সদস্যরা ছেলেদেরকেও ২ দিনের মধ্যে হাজির করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় বলে জানা যায়। অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার দুই গ্রামবাসী হল-

(১) মুনি চাকমা (৫০) পিতা- মঙ্গল চাকমা, গ্রাম- ববিন্দ কার্বারী পাড়া, সাজেক ইউনিয়ন, উপজেলা- বাঘাইছড়ি;
(২) তুহিন চাকমা (৩২) পিতা- জয় লাল চাকমা, ঠিকানা- ঐ

দীঘিনালায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ১ জুম্ম গ্রামবাসী নির্যাতনের শিকার

গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাঘাইছড়ি গ্রামবাসী ননি মারমা (২২) পিতা- অংগ্য মারমা সকাল বেলায় তার নিজ জমিতে হাল চাষ করতে গিয়ে সেখান থেকে তাকে তাতিন্দ্র-রূপায়ণ নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী সদস্য পরিমল চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ধরে নিয়ে যায়। পরে তাকে অমানবিকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। ননি মারমার ছেলে একজন চুক্তি পক্ষের সমর্থক বলে তাকে সেভাবে মারপিট করা হয়ে থাকে বলে জানা যায়। ঐ দিনই পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

কুতুকছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক গ্রামীণফোনের প্রকৌশলীসহ ৩ জন অপহৃত

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকাল ৫ টায় রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ি এলাকা থেকে গ্রামীণফোনের এক প্রকৌশলীসহ দু'জনকে অপহরণ করেছে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

জানা যায়, কুতুকছড়ি বাজার এলাকায় গ্রামীণফোন নেটওয়ার্কের টাওয়ার নির্মাণের কাজ চলছিল। ঘটনার সময়ে গ্রামীণফোনের টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ মো. মোয়াজ নির্মাণকাজ পরিদর্শনে যান। এ সময় মহাপ্রুম উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে তাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতরা হল– গ্রামীণফোনের টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ মো. মোয়াজ ও সহকারী মো. মূছা, গাড়ি চালক সালাউদ্দিন। জানা যায়, নির্মাণাধীন গ্রামীণফোন টাওয়ার থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছিল। এ নিয়ে দরকষাকষি চলছিল। তাই ওই গ্রামীণফোন কর্মকর্তাসহ দু'জনকে অপহরণ করা হয়। পরে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে। কুতুকছড়ি সেনা ক্যাম্পে ৩০০ গজের মধ্যে এ ঘটনা সংঘটিত হলেও সেনাবাহিনী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে জানা যায়।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক মাটিরাঙ্গার এক জুম্ম গ্রামে হামলার চেষ্টা, পরে পলায়ন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার রামসু বাজার এলাকাস্থ জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর হামলার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফের অভিযোগ, তারা ইতোমধ্যে ইউপিডিএফের আহূত সভায় যোগদান করেনি। এদিকে ইউপিডিএফের হামলার চেষ্টার

কথা গ্রামে জানাজানি হলে গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে এবং কয়েকজন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিতে থাকে। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা কোনমতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

চট্টগ্রাম বহদ্দারহাট থেকে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কর্তৃক পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের আকাশ চাকমাকে অপহরণ

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাট বাসসিগন্যাল এলাকা থেকে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ চাকমা (২৮) পীং রাত্তোরাম চাকমাকে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। আকাশ চাকমা রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার চকপুদিঘাট এলাকা থেকে। তিনি কেবিএস গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরী করতেন। সেদিন রাত ৮:০০ টার দিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সদস্যদের উপর হামলা চালায়। এতে ফোরামের সদস্যরা প্রতিরোধ করলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তারপর রাতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা আকাশ চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রতন জীবন চাকমা চাঁদগাঁও থানায়

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী বকুল চাকমা, উদয়ন চাকমা সুপ্রীম, শিবু চাকমাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অপহরণের একটি মামলা করার চেষ্টা করা হলেও পুলিশ এটাকে জিডি (জিডি নং ৮৫১/২০১৩, তারিখ ১৮/০২/২০১৩) হিসেবে নথিভুক্ত করে। থানায় মামলা হিসেবে গ্রহণ না করায় চট্টগ্রাম মুখ্য মহানগর আদালতে সিআর মামলা (মামলা নং ২৭/২০১৩, তারিখ ১৮/০২/২০১৩) দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ এখনো কাউকেই গ্রেফতার করেনি বা অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

চবিতে বহিরাগত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক পিসিপি'র মানববন্ধনে হামলা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সকাল ১১:৩০ ঘটিকার সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর দাবিতে শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এ সময়ে বহিরাগত ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসীরা সেখানে হঠাৎ করে মিছিল শুরু করে। এক পর্যায়ে বহিরাগত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা লাঠি, রডসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং ধাওয়া করে। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল মারমা, সহ সাধারণ সম্পাদক ধনবিকাশ চাক্‌মা, সহ সভাপতি প্রতিম চাকমা, স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক গৌতম চাকমাসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন এবং কোনো রকমে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। পরে পুলিশ তাদের হামলা ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং মিটন চাকমা ও দীপেন চাকমা নামের দু'জন বহিরাগত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীকে আটক করে। ইউপিডিএফ এ ঘটনাকে তাদের উপর হামলা হয়েছে বলে উল্টো অপপ্রচার চালায়।

রামগড়ে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ১ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত, গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা

গত ৪ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:০০টার দিকে ২০/২৫ সদস্যবিশিষ্ট সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলার নাকাপা ইউনিয়নের নাকাপা বাজার চৌধুরী পাড়া থেকে মমং চৌধুরী ওরফে খুবুশি চৌধুরী (৫৫) পিতা-মৃত অংশে চৌধুরীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জানা যায়, মমং চৌধুরী কিছুদিন আগে এক বাঙ্গালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নগদ ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে একটা ব্রিক ফিল্ডের জায়গা দেন। পাড়াবাসীদের সাথে মমং চৌধুরীর সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ টাকায় তারা গ্রামের জরাজীর্ণ বিহারটি পাকা করবেন। সংস্কারপন্থীরা তা জানতে পারলে বিহার নির্মাণের টাকা থেকে তারা চাঁদা দাবি করে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসী ও সংস্কারপন্থীদের মধ্যে তর্কবির্তক হয়। যেহেতু ধর্মীয় স্থাপনা বিষয় তাই সেখান থেকে কোন চাঁদা না নিয়ে বরং গ্রামবাসীরা উল্টো করে আর্থিক সহযোগিতার কথা বলে থাকেন। এরপরই সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা মমং চৌধুরীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এদিকে এই অপহরণকে কেন্দ্র করে গত ৫ মার্চ ২০১৩ সকাল ৯ টায় ঐ মারমা পাড়ার আনুমানিক ৩ শত গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী দাতারাম ত্রিপুরা পাড়ায় হামলা চালায়। এতে ত্রিপুরা পাড়ার কয়েকজন লোককে মারধর করা হয় এবং দোকানপাত ভাঙচুর করা হয় বলে জানা যায়। মারমা গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নাকি দীর্ঘদিন ধরে ঐ ত্রিপুরা পাড়াকে কেন্দ্র করে অবস্থান করে আসছে। সেখান থেকে তারা চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। এর পরপরই সন্ত্রাসীরা মমং চৌধুরীকে নিয়ে এসে গ্রামবাসীদের হাতে বুঝিয়ে দেয় বলে জানা যায়।

দীঘিনালায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের অপহরণের শিকার এক নিরীহ গ্রামবাসী

গত ২৪ মার্চ ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ২:২০ টায় রূপায়ণ-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন ভৈরফা এলাকার নোয়াপাড়া থেকে সন্তোষ চাকমা (৩২) পীং- মৃত জীবন চাকমা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীকে বন্দুকের নলের মুখে অপহরণ করে।

সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী দলের কালেক্টর বর্ণ চাকমার (৮ ও ৯ মাইল এলাকা, খাগড়াছড়ি সড়ক) নেতৃত্বে ১০/১২ সদস্য বিশিষ্ট অপহরণকারীরা প্রথমে দুইটি মাহিন্দ্র অটো-রিক্সা যোগে ভৈরফা বাজারে আসে এবং সন্তোষ চাকমাকে আটক করে। অপহরণকারীরা এসময় সেখানে উপস্থিত স্থানীয় ইউপি সদস্য ঘনশ্যাম ত্রিপুরা মানিককে নীরব থাকতে বলে, তা না হলে কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হবে বলে উল্লেখ করে।

সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির সমর্থকদের পরিবারকে এক সপ্তাহের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। হুমকিপ্রাপ্ত এ সমস্ত পরিবারের সদস্যরা সংস্কারপন্থী দলের নেতা সুধাসিন্ধু খীসার সাথে খাগড়াছড়িস্থ তার বাসভবনে দেখা করে। এসময় সুধাসিন্ধু খীসা উক্ত পরিবারের সদস্যদের ক্ষমা নেই বলে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এলাকা ছাড়তে হবে বলে উল্লেখ করেন।

চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নেতৃবৃন্দের উপর হামলা

গত ২৪ মার্চ ২০১৩ চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার নিউ মুড়িং-এর হক্কিয়া বিল্ডিং-এ পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ সভাপতি বাবু চাকমা, অনিল চাকমা, পূর্ণ বিকাশ চাকমা ও জীবন চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আদিবাসী জুম্ম ঐতিহ্যবাহী জাতীয় উৎসব বিজু-সাংগ্রাই-বৈসু-বিহু উদযাপন সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাজে গেলে শিবু চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। এ হামলায় বাবু চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হন। হক্কিয়া বিল্ডিং-এ বসবাসরত অন্যান্য পাহাড়ি শ্রমিকরা এগিয়ে আসলে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৭ মার্চ ২০১৩ দুপুর ১:০০ টার সময় খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের বেলক্বপাড়ার নিরীহ গ্রামবাসী সতীশ কুমার চাকমা (২৫) পিতা- ধন্যা কুমার চাকমাকে তার ভগ্নীপতি রতন চাকমা, পিতা- মৃত দ্বিগুন্যা চাকমা (বিমল) গ্রাম-চেল্ল্যাতলী এর বাড়ি হতে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা অপহৃত সতীশ কুমার চাকমাকে মারপিট করে গুরুতর জখম করে বলে জানা যায়। আহত অবস্থায় সে ৩০ মার্চ ২০১৩ বন্দী দশা থেকে পালিয়ে যায়। তার পরদিন ৩১ মার্চ ২০১৩ তারিখে আবার সে ইউপিডিএফদের হাতে ধরা পড়ে। সন্ত্রাসীরা তাকে দুই হাতে তালাবদ্ধাবস্থায় বেঁধে রাখে। তালাবদ্ধাবস্থায় সে গত ১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে আবার পালিয়ে আসে। এরপর সে ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ রাত প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে গুরুতর আহতাবস্থায় লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরে অবস্থানকারী জ্যোতিষ দেওয়ান এর আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা যায়। তার কাছ থেকে জানা যায়, তাকে সন্ত্রাসীরা ডানে লক্ষ্মীছড়ি দজর (মোনতলা) এলাকায় নিয়ে বন্দী করে রাখে। উল্লেখ্য যে, ধরা পড়ার একদিন আগে তার ভগ্নিপতির বাড়িতে সে বেড়াতে গিয়েছিল।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ গ্রামবাসীকে অপহরণ এবং ১ জনকে অপহরণের চেষ্টা

গত ৩০ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার দজরপাড়া এলাকা থেকে রূপায়ণ-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহৃত ব্যক্তিরা হলেন- (১) সিয়াম্বর চাকমা (৩৮) পীং- গোপাল চন্দ্র চাকমা, (২) সুধা শংকর চাকমা (৫৫) পীং- সোনারাম চাকমা, (৩) কালাসোনা চাকমা (৪২) পীং- প্রতুল চন্দ্র চাকমা ও (৪) শুভলেন্দু চাকমা (৩২) পীং- রবিচন্দ্র চাকমা। এছাড়া রূপায়ন্ত চাকমা (৪০) পীং- বীর চাকমা, গ্রাম- মধ্যছড়া, লংগদু ইউনিয়ন নামের অপর একজনকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়।

জানা যায়, ঐ দিন সিয়াম্বর চাকমা মাইনীমুখ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যা ৬:৩০ টার দিকে দজর পাড়া বাজারের এক দোকানে পৌঁছলে রাসেল চাকমা ও আপন চাকমা নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল প্রথমে সিয়াম্বর চাকমাকে অপহরণ করে। এরপর একই সন্ত্রাসী দলটি রাত আনুমানিক ৭:৩০ টায় দজরপাড়া এলাকায় হানা দিয়ে অপর তিন গ্রামবাসী সুধা শংকর চাকমা, কালাসোনা চাকমা ও শুভলেন্দু চাকমাকে স্ব স্ব বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এছাড়া এই সন্ত্রাসীরা রাত আনুমানিক ১:০০ টায় সোনাই এলাকায় হানা দিয়ে সেখানে বেড়াতে আসা রূপায়ন্ত চাকমাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে অপহরণের চেষ্টা করে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি টের পেয়ে রূপায়ন্ত চাকমা কোন মতে পালাতে সক্ষম হয় এবং পরে স্থানীয় সোনাই আর্মি ক্যাম্পে (ইসলামাবাদ আর্মি ক্যাম্প) আশ্রয় গ্রহণ করে। জানা যায় যে, প্রবল প্রতিবাদের মুখে পরে অপহৃত উক্ত চারজনকে সন্ত্রাসীরা ছেড়ে বাধ্য হয়।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৩০ মার্চ ২০১৩ দুপুর প্রায় ১২:০০ টায় সংস্কারপন্থী সুগত চাকমা ও নয়ন চন্দ্র চাকমা (৫০) পিতা- সপ্ত মোহন চাকমা, গ্রাম- করল্যাছড়ি, থানা- লংগদু এর নেতৃত্বে ৬/৭ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার ডানে আটারকছড়া নিবাসী জয়সিং চাকমা (৪৩) পীং- কৈলাশ ধন চাকমাকে ডানে আটারকছড়ার ডাঙ্গা বাজার থেকে ডেকে নিয়ে যায়। সে সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলে মনে করেছিল কোন দরকার বশত তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু আজ অবধি জয়সিং চাকমা ফেরৎ না আসার পর জানতে পারে যে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তা জানাজানি হলে তাকে কি কারণে অপহরণ করা হয়েছে জানতে চাওয়া হলে তিনি নাকি সংস্কারপন্থীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চুক্তি পক্ষের লোকদের কাছে জানিয়ে দেয় বলে অভিযোগ তুলে অপহরণকারীরা। প্রবল প্রতিবাদের মুখে পরে অপহৃত উক্ত চারজনকে সন্ত্রাসীরা ছেড়ে বাধ্য হয় বলে জানা যায়।

সাভারে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক দিলীপ চাকমার উপর হামলা, ৩ মাসের শিশুসহ ৫ জন আহত

গত ১ এপ্রিল ২০১৩ ঢাকা জেলাধীন সাভার আশুলিয়া থানাস্থ গাজীরচর এলাকায় মহরম আলী ফ্ল্যাটে দিলিপ চাকমা ও তাঁর পরিবারের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী সংঘবদ্ধ হামলা চালায়। এ হামলায় দিলীপ চাকমার স্ত্রী ও ৩ মাসের শিশুসন্তানসহ ৫ জন আহত রয়েছে। সরেজমিন তদন্তে ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পেলেও পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করেনি। ইউপিডিএফ সমর্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ঘজন্য হামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেদিন সোমবার দিলীপ চাকমা তিন বন্ধু সুমন চাকমা, ললিত চাকমা ও সুজন চাকমার সাথে নিজ বাসায় কথা বলছিলেন ও টেলিভিশন দেখছিলেন, এসময় আনুমানিক বিকাল ৬:০০ ঘটিকায় মুক্তি চাকমার নেতৃত্বে ১৫-২০ জন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী সংঘবদ্ধ হামলা চালায়। কোন কিছু বুঝার আগেই সন্ত্রাসীরা দিলীপ চাকমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় সন্ত্রাসীরা দোলনায় ঘুমন্ত দিলীপ চাকমার তিনমাস বয়সের শিশু সন্তান ও তাঁর স্ত্রীও হামলা থেকে রেহাই দেয়নি। শিশুটিকে লাথি মেরে দোলনা থেকে ফেলে দেয় সন্ত্রাসীরা। এতে শিশুটি গুরুতর আহত হয়। আর দিলীপ চাকমার স্ত্রীকে লাঠিসোটা দিয়ে উপর্যপুরি আঘাত করে রক্তাক্ত করে। হামলায় সন্ত্রাসীরা বাড়ির যাবতীয় মালামাল ভাঙচুর করে এবং টাকা পয়সা ও দিলীপ চাকমার স্ত্রীর গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এ হামলায় দিলীপ চাকমা, সুমন চাকমা ও সুজন চাকমা গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় কিছু সংখ্যক বাঙালি ও ফ্লাটের কয়েকজন চাকমা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হামলাকারীরা পালিয়ে যায় এবং ঘটনার শিকার সবাইকে পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা করানো হয়। তাৎক্ষণিক ফ্লাটের একজন প্রতিনিধি মোবাইলে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে

(ওসি) মোবাইলে ফোন করলে আগুলিয়া থানা থেকে এসআই মোঃ আবুল কালাম আজাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসআই মোঃ আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। এ হামলার ঘটনায় ২ এপ্রিল ২০১৩ দিলীপ চাকমা বাদী হয়ে আগুলিয়া থানায় হামলাকারী- (১) মুক্তি চাকমা (৩৫), (২) নাগুলোং চাকমা (২৫), (৩) বিমল চাকমা (২৫), (৪) বীর কান্তি চাকমা (৩২), (৫) তপন চাকমা ওরফে লাম্বু (৩০), (৬) অনিল চাকমা (৪৫), (৭) সুজায়ন চাকমা (৩৭), (৮) নিশান চাকমা (২৯), (৯) সুচারু চাকমা (৪০), (১০) তুষার কান্তি চাকমা (২৬), (১১) নিকশন চাকমা (২৭), (১২) খুকুমনি চাকমা (২৪), (১৩) জগদিশ চাকমা (৪০), (১৪) প্রীতিময় চাকমা (২৪), (১৫) জ্যোতি চাকমা (২৮), (১৬) এপোলো চাকমা (২৭), (১৭) সোহেল চাকমা (২৯)সহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং- ০৫, তারিখ ০২-০৪-২০১৩ বাংলাদেশ দন্ডবিধির ধারা-১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩৫৪/৩৭৯/৪২৭/৫০৬। হামলাকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বর্তমানে পলাতক রয়েছে। পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, দিলীপ চাকমা একজন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থককারী এবং সাভার এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে প্রচারাভিযান কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সমর্থন করায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা তাঁর উপর এ হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউপিডিএফ সমর্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি শৈলজা বিকাশ চাকমা, সহ সভাপতি পুলক জীবন খীসা ও সুভাশিষ চাকমা, আওয়ামী লীগের জ্ঞান বিকাশ চাকমা মিঠুগুলো প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে দিলীপ চাকমার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে গত ৫ এপ্রিল ২০১৩ আগুলিয়া প্রেসক্লাবের সামনে মামলায় অভিযুক্ত ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের পরিবার-পরিজনদের এক মানববন্ধনের আয়োজন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির নেতৃবৃন্দ মামলায় অভিযুক্ত হামলাকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করার জন্য পুলিশের উপর নানাভাবে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছেন বলেও জানা গেছে। এ নিয়ে এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতির নেতৃবৃন্দের উপর চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাটিরাঙ্গায় ২ জন গ্রামবাসীর নিকট পঞ্চাশ হাজার করে ইউপিডিএফের চাঁদা দাবি

গত ২ এপ্রিল ২০১৩ ইউপিডিএফের ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার (১) নন্দের বাশি ত্রিপুরা (৬০) পিতা- মৃত তরুণী কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম- তরুণী পাড়া ও (২) শ্রীদাস ত্রিপুরা (৫০) পিতা- মৃত গণেশ কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম- প্রার্থনা কুমার কার্বারী পাড়া- এই দু' ব্যক্তির প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দাবিকারী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নাম নিম্নে দেয়া গেল-

১। চন্দন চাকমা (৩৫) পিতা- অজ্ঞাত, ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র কালেক্টর;
২। পঞ্চসেন ত্রিপুরা (২২) পিতা- কুকসেন ত্রিপুরা, গ্রাম-শভ রঞ্জন হেডম্যান পাড়া, ৫ নং বেলছড়ি ইউনিয়ন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। সভাপতি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, মাটিরাঙ্গা থানা;
৩। ককছা ত্রিপুরা (৪০) পিতা- মৃত শশী রঞ্জন ত্রিপুরা, গ্রাম- সর্বসিদ্ধি পাড়া, মাটিরাঙ্গা, ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্য;
৪। প্রবীর ত্রিপুরা (২৫) পিতা- বিশ্বরাম ত্রিপুরা, গ্রাম- সর্বসিদ্ধি পাড়া, সভাপতি, পিসিপি, মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখা, ইউপিডিএফ;
৫। সুজিত ত্রিপুরা (১৯) পিতা- ভাগ্যধন ত্রিপুরা, গ্রাম- লক্ষ্মীচরণ মাস্টারপাড়া, গুমতি, মাটিরাঙ্গা, ইউপিডিএফ এর সমর্থক।

সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক লংগদু থেকে আরও দু' জন নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২ এপ্রিল ২০১৩ রাত ৮:০০ টায় রূপায়ণ-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের একটি সশস্ত্র দল কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা থেকে আবার নিরীহ দু'জন গ্রামবাসী অপহরণ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, লংগদু উপজেলার মহাজন পাড়া থেকে নিরীহ গ্রামবাসী সুমতি রঞ্জন চাকমা (৪৫) পিতা- লালিত রঞ্জন চাকমা ফিরিঙ্গ্যাকে এবং লংগদুর বাট্যা পাড়াবাসী বিকো চাকমা (২৫) পিতা- ভাগ্য লাল চাকমা মেদেরাকে রাসেল চাকমা ও আপন চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে।

তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির মিথ্যা অভিযোগ এনে পিডিসি নেতৃবৃন্দকে সংবাদ সম্মেলন করতে বাধ্য করেছে ইউপিডিএফ,

বললেন জ্যোতি দেওয়ান ও মহেন্দ্র চাকমা

গত ২ এপ্রিল ২০১৩ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'তথাকথিত বোরকা পার্টির সদস্য হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জনগোষ্ঠী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের পাড়া উন্নয়ন কমিটির (পিডিসি) জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের যে অভিযোগ' আনা হয়েছে তা জ্যোতিষ দেওয়ান ও মহেন্দ্র চাকমা অস্বীকার করলেন। পিডিসি'র নেতৃবৃন্দ গত ১ এপ্রিল খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতির ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা বলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে পিডিসি'র নেতৃবৃন্দের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তাঁরা কথিত বোরকা পার্টি নামে কোন পার্টি বা গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত নয় বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথেও জড়িত নয় এবং তাঁরা পিডিসি'র জন্য ইউএনডিপি কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকেও কোন ধরনের চাঁদা দাবি করেননি; চাঁদা দাবি করার প্রশ্নই আসে না বলে জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা আরো উল্লেখ করেন যে, ইউপিডিএফ নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এযাবৎ লক্ষ্মীছড়ি এলাকাসহ খাগড়াছড়ির কতিপয় এলাকায় নিরীহ লোকদের অপহরণ, খুন, মুক্তিপণ আদায়, নিরীহ গ্রামবাসী- চাকুরীজীবী-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ১৪৪টি পিডিসি'র মধ্যে ১১৫টি পিডিসি থেকে ইউপিডিএফ ২০,০০০ টাকা করে মোট ২,৩০,০০০ টাকা অস্ত্র কেনার নামে জোরপূর্বক আদায় করে নিয়েছে।

ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এরূপ নির্যাতন ও নিপীড়ন বিষয়ে কথা বলার জন্য কিছু দিন আগে পিডিসি'র কিছু লোক তাঁদের সাথে কথা বলতে আসে। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ইউপিডিএফের এসব অপতৎরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এই সংবাদ পাওয়ার পর পরই পিডিসি'র নেতৃবৃন্দকে তাঁদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করা এবং চাঁদা দাবির করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে ধরার জন্য বাধ্য করে বলে তাঁরা জানান। এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন না করলে পিডিসি নেতৃবৃন্দকে অপহরণ ও খুন করা হবে মর্মে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয় বলে তারা উল্লেখ করেন। পিডিসি নেতৃবৃন্দ প্রাণের ভয়ে ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে উল্টো তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে এই সংবাদ সম্মেলন করতে বাধ্য হন বলে তারা জানান।

এমনকি ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা পিডিসি নেতৃবৃন্দের উক্ত সংবাদ সম্মেলনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার আয়োজন করে দিয়েছে এবং সংবাদ সম্মেলনে গিয়ে পিডিসি নেতৃবৃন্দ স্রেফ ইউপিডিএফের লিখে দেয়া সংবাদ বিবৃতি তোতা পাখির মতো পাঠ করে এসেছে বলে তারা জানান।

চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নেতৃবৃন্দের উপর আবার হামলা

গত ৪ এপ্রিল ২০১৩ চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার ২নং মাইলের মাথায় পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের অনিল চাকমা, পূর্ণ বিকাশ চাকমা ও নিকো চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আদিবাসী জুম্ম ঐতিহ্যবাহী জাতীয় উৎসব বিজু-সাংগ্রাই-বৈসু-বিহু উদযাপন সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাজে গেলে শিবু চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। এলাকায় বসবাসরত অন্যান্য পাহাড়ি শ্রমিকরা এগিয়ে আসলে পরে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

সেনাবাহিনীর নাকের ডগায় রাঙামাটির এক স'মিল থেকে ইউপিডিএফ কর্তৃক অস্ত্রের মুখে দুই বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ

গত ১৭ এপ্রিল ২০১৩ রাঙামাটি শহরের সেনাবাহিনীর জলযান ঘাট সংলগ্ন রাজবাড়ী স'মিল থেকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে দু' জন বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ সময় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে এবং কাঠ ভর্তি একটি ইঞ্জিন-চালিত বোর্টে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেদিন সন্ধ্যা পৌনে আটটার দিকে তপন জ্যোতি চাকমা বর্মার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা একটি ইঞ্জিন-চালিত বোর্ট যোগে এসে রাজবাড়ি স'মিলে হামলা চালায়। এ হামলায় প্রথমে কাঠ বোঝাই একটি ইঞ্জিন-চালিত বোর্টে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এরপর সাহেব আলী (৫২) ও শফি (৫৫) নামে স'মিলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দু'জন শ্রমিককে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা রাজবন বিহার ও চাকমা রাজবাড়ীর মধ্যবর্তী জলপথ দিয়ে উত্তর দিকে চলে যায় বলে জানা যায়। মুক্তিপণ আদায় এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির ইন্ধনদানের উদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ এ হামলা ও অপহরণ করতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। জানা গেছে যে, অপহরণের পর পরই ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা কাঠের পারমিট গ্রহীতা ২৬/২৭ জনের একটি তালিকা পাঠিয়েছে এবং অপহৃতদের মুক্তির শর্ত হিসেবে অতিসত্বর চাঁদা প্রদান করতে উক্ত ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছে। গত ১৯ এপ্রিল ২০১৩ অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তথা নিরাপত্তা বাহিনীর চাদরে ঢাকা খোদ রাঙামাটি শহর এলাকায় ঢুকে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে যেভাবে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে অপহরণ করে নিয়ে যায় তা নিয়ে জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রশাসন তথা সরকারী বাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ না থাকলে শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে এ ধরনের হামলা ও অপহরণ কখনোই সম্ভব নয় বলে এলাকাবাসী মনে করে। উল্লেখ্য, এর আগেও গত ৩ ডিসেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটির ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র সমতাঘাট থেকে স'মিলের একজন ম্যানেজারসহ ৩ জন বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে হামলা ও অপহরণ করলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তথা নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করা বা গ্রেফতারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অথচ জলপথ অনায়াসে সন্ত্রাসীদের ধাওয়া সম্ভব বলে এলাকাবাসী মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি যার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি রাজনৈতিভাবে মোকাবেলা করার প্রয়াস শুরু হয়। সেই সাথে চলতে থাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল গঠনের কার্যক্রমও। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' নামে গঠিত হয় জুম্ম জনগণের প্রথম ও একমাত্র রাজনৈতিক দল। সেই সাথে সূচিত হয় এই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের গৌরবময় রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের।

সংগঠন সংবাদ

ইউএনপিও'র ১১তম সাধারণ সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির যোগদান

গত ২৯-৩০ নভেম্বর ২০১২ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অনুষ্ঠিত আনরিপ্রেজেন্টেড নেশন ও পিপলস্ অর্গানাইজেশনের (ইউএনপিও) ১১তম সাধারণ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা যোগদান করেন। ইউএনপিও'র চেয়ারম্যান নাওয়াং চোপেল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সাধারণ সম্মেলনে ইউএনপিও'র মোট ৪২ সদস্যের মধ্যে ২২ সদস্য জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যের মধ্যে এশিয়া থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম, তিব্বেত, চিন, খেমার ক্রম, মং, বালুচিস্তান, সিন্ধি ইত্যাদি সদস্য জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি যোগদান করেন। অধিবেশন শুরুতেই সংগঠনের চেয়ারম্যান নাওয়াং চোপেল এবং মহাসচিব মারিনো বুস্‌দাচিন স্ব স্ব প্রতিবেদন প্রদান করেন। তারা বলেন, ইউএনপিও তার সদস্য জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মানবাধিকারের প্রসারে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি অন্যান্য সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে বলে তারা জানান।

এরপর তিনটি নতুন সদস্যের আবেদন উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাদের আবেদন গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের সাধারণ বিতর্কে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মঙ্গল কুমার চাকমা ইউএনপিও'র সদস্যদের অঞ্চলে সামরিকীকরণ, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জনসংখ্যা স্থানান্তর, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অস্বীকৃতি, রাষ্ট্র ও ইএনপিও সদস্যদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়ন না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করে। তিনি ইউএনপিও সচিবালয়কে জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অধিকতর পরিমাণে জনমত গঠন ও প্রচারাভিযান চালানোর আহ্বান জানান। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সদস্য জাতি ও জাতিগোষ্ঠীসমূহের রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এক রেজুলেশন গ্রহণ করা হয় যেখানে বাংলাদেশ সরকারকে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঘোষিত অর্থ বরাদ্দের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদককে বাংলাদেশ সফর, আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের ২০১১ সালে গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জোরালো উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। উক্ত সম্মেলনে সংগঠনের নতুন ৯ সদস্যক প্রেসিডেন্সী গঠিত হয় এবং চেয়ারম্যান ও মহাসচিব হিসেবে যথাক্রমে নাওয়াং চোপেল ও মারিনো বুস্‌দাচিন পুনঃনির্বাচিত হন। সম্মেলন শেষে ইউএনপিও'র প্রতিনিধিদল জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তারপর জাতিসংঘ অফিসের সামনে ভাঙা চেয়ার প্রাঙ্গণে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারের দাবি মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়।

দুর্নীতিমুক্ত এবং পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে রাঙ্গামাটিতে পিসিপির মানববন্ধন

গত ১৫ নভেম্বর ২০১২ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে দলীয়করণমুক্ত, স্বজনপ্রীতিমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু এবং আদিবাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ প্রদানের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রনঞ্জয় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কলেজ শাখার সভাপতি রনো চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা, অভিভাবক নমিতা চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক রিপেশ চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তীতেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন দফায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও চুক্তির বিধান লংঘনের অভিযোগ উঠেছে। গত ২২ আগস্ট ২০১২ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ২৬৩ জন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও ব্যাপক দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠে। উদাহরণস্বরূপ সেসময় অভিযোগ উঠে যে, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ক্রমিক সংখ্যা ০৬৯৬ ও বাঘাইছড়ি উপজেলার ক্রমিক সংখ্যা ০২৩৬ প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার কোন প্রমাণ ছিল না। অথচ তাদের ক্রমিক সংখ্যা নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তারা মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হয়েও চাকরি পান। আর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় একই পরিবারের চারজন বা একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এভাবে অনিয়ম, দুর্নীতি ও সরকারী দলের দলীয়করণের ফলে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে, তৎস্থলে অযোগ্য প্রার্থীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এভাবে চলতে থাকলে পার্বত্য এলাকার শিক্ষার মান চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

এহেন প্রেক্ষাপটে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১৬ নভেম্বর ২০১২ আবার ৪৩ জন প্রাথমিক শিক্ষক (সহকারী শিক্ষক ৪০ জন, প্রধান শিক্ষক ৩ জন) নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও লিখিত পরীক্ষাকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে উক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ সকল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি বা নিয়োগ বাণিজ্য রুখে দাঁড়ানো ও বন্ধের লক্ষ্যে দলীয়করণমুক্ত, অনিয়মমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা; পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক আদিবাসী জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ প্রদান করা; নিয়োগ কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসারে নিয়োগ পরীক্ষার খাতা যথাযথভাবে তৈরি করার দাবি জানানো হয়।

তুমাচিং মারমা হত্যার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তি দাবিতে এইচডব্লিউএফ ও পিসিপির বিক্ষোভ ও সমাবেশ

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ বিকাল ৩:৩০ টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৪ বছরের তুমাচিং মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যা ঘটনার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বনরূপা প্রদক্ষিণ করে এসে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক টোয়েন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রনঞ্জয় চাকমা।

বক্তারা তুমাচিং মারমা হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের বড়ডলু গ্রামে তুমাচিং মারমা (১৪) পিতা: মৃত সুইথুইপ্রু মারমা নামের এক মারমা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।

রাঙ্গামাটিতে ৩ সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সিআইডি রিপোর্ট বাতিল এবং নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তসহ ন্যায়বিচারের দাবি

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৩ সকাল ১১:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যৌথ উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সিআইডি রিপোর্ট বাতিল এবং নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তসহ ন্যায়বিচারের দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। বিক্ষোভ মিছিলটি জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বনরূপা ঘুরে এসে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সিনিয়র সদস্য জ্যোতিপ্রভা লারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক রিপেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ কমিটির সভাপতি রনো চাকমা। সমাবেশটি

পরিচালনা করেন নারী নেত্রী জোনাকী চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ সাড়ে ১৬ বছরেও কল্পনা চাকমার কোন হদিশ না পাওয়া, দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করা রাষ্ট্র, সরকার বা প্রশাসনের ব্যর্থতা বলে অভিহিত করেন। তাঁরা সম্প্রতি সিআইডি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্টও কল্পনার হদিশ দানে ব্যর্থ এবং অভিযুক্ত তৎকালীন লে: ফেরদৌসসহ দোষীদের চিহ্নিত করার পরিবর্তে আড়াল করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন। নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় উদ্বেগজনকভাবে নারীর উপর সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এবং এ পর্যন্ত সংঘটিত নারীর উপর সহিংস ঘটনার একটিরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ দাখিলকৃত কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সিআইডির চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট বাতিল এবং ঘটনার নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য পুনঃতদন্তসহ ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করা; অবিলম্বে চিহ্নিত অপহরণকারী সেনা কর্মকর্তা ফেরদৌস, ভিডিপি কমান্ডার নুরুল হক ও সালেহ আহম্মদসহ দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা; ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অত্রাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি এবং নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করার দাবি জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ জনৈক তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক চট্টগ্রাম জোন সিআইডির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয় এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে রাঙ্গামাটিস্থ জজ আদালতে ১৩ জানুয়ারি ২০১৩ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। উক্ত সিআইডি তদন্ত রিপোর্টেও অপহৃত কল্পনার কোন হদিস না পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয় এবং অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তা লে: ফেরদৌসসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের এড়িয়ে যাওয়া হয়।

জ্বালানির বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ দলের স্মারকলিপি

দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে জ্বালানির বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করার দাবিতে গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ দশটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ঢাকা জেলা প্রশাসক শেখ মোহাম্মাদ ইউসুফ হোসেন এই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। দশ দলের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই স্মারকলিপি হস্তান্তর ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ঢাকা মহানগর সম্পাদক কমরেড কিশোর রায়। এসময় উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড কামরুল আহসান, ওয়ার্কার্স পার্টির ঢাকা মহানগর সদস্য কমরেড সাব্বাহ আলী খান কলিন্স, বাসদ (বিএসডি) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক রেজাউর রশিদ, গণঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতা আলহাজ্ব সফল আলী, শাহবুদ্দিন আহম্মেদ, জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি জুয়েল চাকমা, সাম্যবাদী দলের নেতা এম. দেলোয়ার হোসেন, গণতন্ত্রী পার্টির নগর নেতা কমল ঘোষ প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ইতোমধ্যে সরকার সকল প্রকার জ্বালানির মূল্য আরেকবার বৃদ্ধি করেছে। পঞ্চমবারের মতো এই মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত গরিব মেহনতি মানুষের উপর নতুন করে কষ্টের বোঝা চাপানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ এমনিতেই মূল্যস্ফীতির চাপে আছে, বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঠেকানো যাচ্ছে না। পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ঘটলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আরেকবার বাড়বে। অন্যদিকে কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে জনজীবনে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে। এমতাবস্থায় জনগণের সংকট নিরসনে ১০টি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়। স্মারকলিপি প্রদান শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান ফটকে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ঢাকা মহানগর সম্পাদক কমরেড কিশোর রায়। এসময় ১০টি দল যথাক্রমে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, গণঐক্য, সাম্যবাদী দল, গণআজাদী লীগ, বাসদ (বিএসডি), পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি এবং ন্যাপ এর কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দ।

অরাজকতা সৃষ্টিকারী জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি ১০ দলের

সারাদেশে জামাত-শিবিরের তাণ্ডবের প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণআজাদী লীগের সভাপতি হাজী আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে ১০ দলের এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড আনিসুর রহমান মল্লিক, গণঐক্যের আহ্বায়ক পংকজ ভট্টাচার্য, ন্যাপের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইসমাইল হোসেন, গণতন্ত্রী পার্টির ঢাকা মহানগর সভাপতি কমল ঘোষ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বিএসডি) আহ্বায়ক রেজাউল রশিদ খান, জনসংহতি সমিতির নেতা দীপায়ন খীসা, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. অসিত বরণ রায়, সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতা মোসাহেদ আহমেদ প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জামাত-শিবির যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় বানচাল করার জন্যই সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে তাণ্ডব চালাচ্ছে। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরও কঠোর হয়ে একাত্তরের ঘাতক এই চক্রের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ইতিমধ্যে রায় ঘোষিত বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসি কার্যকরসহ অপরাপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান। জামাত-শিবির চক্রের অরাজকতার বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক মুক্তিকামী মানুষকে সজাগ থেকে প্রতিরোধের আহ্বান জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ সরকার এর মৃত্যুতে জনসংহতি সমিতির গভীর শোক প্রকাশ

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৪:৩০ টার দিকে সাবেক সংসদ সদস্য, আদিবাসী জনগণের বন্ধু ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ সরকার (৭২) এর মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে সজীব চাকমা স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উল্লেখ করে যে, তাঁর মৃত্যুতে জুম্ম জনগণ তাদের এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারালো।

বোমাং সার্কেলের চীফ উ ক্য সাইন প্রু চৌধুরীর মৃত্যুতে জনসংহতি সমিতির শোকবার্তা

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দিবাগত রাত আনুমানিক ৩:১৫ টায় বোমাং সার্কেলের চীফ তথা ১৬তম রাজা উ ক্য সাইন প্রু চৌধুরীর (৭৯ বছর) মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানায়। তাঁর মৃত্যুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম এক সংগঠককে হারালো বলে সজীব চাকমা স্বাক্ষরিত জনসংহতি সমিতির উক্ত শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবিতে ১০ দলের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকেল ৪টায় ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ১০ দলের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরুর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত সভায় ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, শাহবাগের জমায়েত প্রমাণ করেছে জাতি যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্নে কতখানি ঐক্যবদ্ধ। জনগণের এই ঐক্যকে আরও দৃঢ় সংগঠিত করে এগুতে হবে।

১০ দলের এ সভায় বক্তব্য রাখেন গণ ঐক্যের আহ্বায়ক পংকজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড নুর আহমদ বকুল, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডা. শহিদুল্লাহ শিকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা দীপায়ন খীসা, ন্যাপের আব্দুর রশিদ, বাসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক রেজাউর রশিদ খান, সাম্যবাদী দলের হারুন চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন ওয়ার্কার্স পার্টির নগর সম্পাদক কিশোর রায়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

শাহবাগের চলমান তারুণ্যের আন্দোলনের সাথে জনসংহতি সমিতির সংহতি জ্ঞাপন

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সকল যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত তরুণ প্রজন্মের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একাত্মতা ও সংহতি ঘোষণা করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ সারা দেশের আদিবাসী জনগণ চলমান এই আন্দোলনে শুরু থেকে সক্রিয় রয়েছে বলে উক্ত সংহতি ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। ঢাকার শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চ কর্তৃক ঘোষিত সেদিন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দেশব্যাপী ৩ মিনিটের নীরব অবস্থানের সমর্থনে জনসংহতি সমিতি রমনার শিশু পার্কের

সামনে অবস্থান গ্রহণ করে। তরুণ প্রজন্মের এই আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এবং একটি অসাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বৈষম্য মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মের এই জাগরণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কাউন্সিল

বাঘমারা থানা : গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র-যুব-জনতার আন্দোলন জোরদার করি, ইস্পাত-কঠিন ঐক্য গড়ে তুলি' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘমারা থানা শাখার ১৫তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঘমারা বাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনোত্তর সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘমারা থানা শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা মংশৈসা মারমা। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা, জনসংহতি সমিতি রোয়াংছড়ি উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি অংথোয়াইচিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক রনো চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছাত্রনেতা উবাসিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রোয়াংছড়ি থানা শাখার সভাপতি প্রীতিভূষণ তঞ্চঙ্গ্যা। সমাবেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘমারা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনিল খুফ্যাঁই ত্রিপুরা।

সমাবেশ শেষে মংশৈসা মারমাকে সভাপতি, ক্যশৈনু মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নুক্যমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট বাঘমারা থানা শাখার কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা নিত্যলাল চাকমা।

আলিকদম থানা : গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলন জোরদার করুন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আলিকদম থানা শাখার ৭ম সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানীত সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি উছোমং মারমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ভূমি বিষয়ক সম্পাদক মংসানু মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক রিপেশ চাকমা, বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিত্যলাল চাকমা, বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা মুকুল চাকমা। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আলিকদম থানা শাখার সদস্য সচিব বিচিত্র তঞ্চঙ্গ্যা। সম্মেলনে

সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আলিকদম থানা শাখার আহবায়ক সূর্য ত্রিপুরা এবং সঞ্চালনা করেন ছাত্রনেতা সুশান্ত তঞ্চঙ্গ্যা। সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সূর্য ত্রিপুরাকে সভাপতি, বিচিত্র তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রুচিং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আলিকদম থানা কমিটি গঠন করা হয়।

■ **রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা :** গত ২ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটির আশিকা হল অডিটোরিয়ামে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার ১৭তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়। 'শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ইস্পাত-কঠিন সংগ্রামে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে উক্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, জেলা শাখার যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের খণ্ডকালীন শিক্ষক বসুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা ও রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি রনঞ্জয় চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের চিত্র তুলে ধরেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে রিন্টু চাকমাকে সভাপতি, দীপেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুমিত্র চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ (একুশ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক নতুন বিকাশ চাকমা।

■ **বান্দরবান সরকারী কলেজ ও বান্দরবান সদর থানা শাখা :** গত ১০ মার্চ ২০১৩ 'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে ছাত্র সমাজের ইস্পাত–কঠিন ঐক্য গড়ে তুলুন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) বান্দরবান সরকারি কলেজ ও বান্দরবান সদর থানা শাখার যৌথ কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে মধ্যমপাড়াস্থ জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কার্যালয় হতে একটি র‍্যালি বান্দরবান শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা কার্যালয়ে শেষ হয়। পার্টির জেলা কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান সদর থানা শাখার সংগ্রামী সভাপতি ছাত্রনেতা উবাসিং মারমা। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুমা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অংথোয়াইচিং মারমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা শাখার সভাপতি উচসিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সহ–সভাপতি নিত্যলাল চাকমা, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিষ্ণু চাকমা, বান্দরবান টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ শাখার সভাপতি মুকুল চাকমা, বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সহ–সভাপতি ছাত্রনেতা সাইংথোয়াই মারমা, বান্দরবান সদর থানা শাখার সহ-সভাপতি উসাইনু মারমা, সাধারণ সম্পাদক উখিংহ্লা মারমা প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সুজয় চাকমা।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এবং চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র সমাজের ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সাইং থোয়াই মারমাকে সভাপতি, অজিত তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং উহাইনু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে বান্দরবান সরকারি কলেজ কমিটি এবং উসাইনু মারমাকে সভাপতি, উখিংহ্লা মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অংচ মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে বান্দরবান সদর থানা কমিটি গঠন করা হয়।

জুরাছড়ি থানা : রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে গত ১৮ মার্চ ২০১৩ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জুরাছড়ি থানা শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে মনিষ তালুকদারকে সভাপতি, শ্যামল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, সুমেধ দেওয়ানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জুরাছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়।

বান্দরবানে ১৮তম অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত

গত ১৫ মার্চ ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮তম অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার প্রথম সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য প্রশাসনের সাথে যোগসাজস করে তৎকালীন ভূঁইফোড় সংগঠন শান্তি কমিটি নামে একটি দল পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের উপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায় এবং উজানী পাড়া ও মধ্যম পাড়ার প্রায় তিন শতাধিক ঘরবাড়ি লুঠপাট ও আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঐদিন হতে ১৫ মার্চকে প্রতিবছর অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। উক্ত দিবসটি উপলক্ষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে মধ্যমপাড়াস্থ জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয় হতে এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের

গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বান্দরবান প্রেস ক্লাব চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা মংস্থ মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা সভাপতি জননেতা উচসিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিত্যলাল চাকমা, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা জেমসন আমলাই, বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছাত্রনেতা উবাসিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা অজিত তঞ্চঙ্গ্যা। সঞ্চালনা করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা সাইংথোয়াই মারমা।

বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৯৫ সালে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উজানী পাড়া ও মধ্যম পাড়ার তিন শতাধিক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হলেও এখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সমাবেশ থেকে আবারো ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও তদন্তপূর্বক দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান ১০ দলের

গত ২ মার্চ ২০১৩ তোপখানা রোডস্থ শহীদ আসাদ মিলনায়তনে গণঐক্যের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দশটি বাম প্রগতিশীল দলের সভা যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস, আতঙ্ক ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ঘৃণ্য তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। সভায় বলা হয় এই নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টায় অতীতের মতো দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। সভায় গত ক'দিনের জামাত-শিবিরের এই আক্রমণাত্মক আচরণের নিন্দা না জানিয়ে সরকার, প্রশাসন ও জনগণের প্রতিরোধকে বিরোধী দল বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক 'গণহত্যা' আখ্যাদানকে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অবিমৃষ্যকারীতা অভিহিত করে বলা হয়, এর মধ্য দিয়ে বিরোধী দল নেত্রী একাত্তরের গণহত্যাকারীদের সরাসরি পক্ষাবলম্বন করেছেন। দশ দলের সভায় যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্নে বিএনপির ভূমিকার নিন্দা করে বলা হয় কোন যুক্তির আড়ালে এই বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। দশ দলের সভায় জামাত-শিবির ও বিএনপির এই আচরণের পিছনে পশ্চিমা শক্তিসমূহের মদদ ও সহায়তা দানের উল্লেখ করে বলা হয় পশ্চিমা গণমাধ্যমে বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে ইসলাম বনাম স্বাধীনতা বলে আখ্যাদান করে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করা হচ্ছে যা সত্যের অপালাপ। বস্তুত দেশের আলেম ওলামাগণও জামাত-শিবিরের এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে।

সভায় দেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তি, শ্রেণী-পেশার সংগঠন, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করার আহ্বান জানান হয়। সভায় ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন এমপি, বিমল বিশ্বাস, নুর আহমদ বকুল, গণআজাদী লীগের হাজী আব্দুস সামাদ ও আব্দুল জব্বার, ন্যাপের এ্যাড. ইসমাইল হোসেন, আব্দুর রশিদ সরকার, গণতন্ত্রী পার্টির নুরুর রহমান সেলিম, অধ্যাপক ডা. শহিদুল্লাহ শিকদার, শাহাদাত হোসেন ও কামরুল আহসান খান পারভেজ, গণঐক্যের এ্যাড. আবদুল সবুর, হরিসাধন ব্রাহ্মণ, সাম্যবাদী দলের হারুন চৌধুরী, জনসংহতি সমিতির দীপায়ন খীসা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বিএসডি)-র রেজাউর রশীদ খান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গত কয়দিনে দেশের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল সাতক্ষীরা, নোয়াখালী, ফেনী, সাতকানিয়া, বাঁশখালি, গাইবান্ধায় দশ দলের প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

গত ৮ মার্চ ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে সকাল ৯:৩০ টায় শহরের প্রধান সড়কে বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত ব্যানার, প্লাকার্ড ও ফেস্টুনসহ একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। এরপর সকাল ১০:০০ টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'অপ্রতিরোধ্য গতিশীলতায় নারী মুক্তি আন্দোলন' এই শ্লোগানকে সামনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি জড়িতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মাধবীলতা চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি কণিকা বড়ুয়া, জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, ব্লাস্টের রাঙ্গামাটি জেলার সমন্বয়ক এ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরের স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুনির্মল দেওয়ান ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা এবং আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন মহিল সমিতির সুপ্রভা চাকমা ও মনি চাকমা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সন্তু লারমা বলেন, 'পার্বত্য অঞ্চলে ১৫ ভাষাভাষি জাতি বসবাস করে। এসব জাতির মধ্যে জনসংখ্যা

অনুপাতে নারীদের অবস্থান প্রায় সমান সংখ্যক। তাই আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে পারি যে, নারীর যে অবস্থান এবং ভূমিকা সেটা অনস্বীকার্য এবং অপরিহার্য। আজকে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের যে সমাজ জীবন ও জীবনাধারায় আমরা বসবাস করি, তাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এখানে নারী সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে নারী সমাজের মধ্যে যে আন্দোলন-সংগ্রাম, নারীমুক্তির আন্দোলন, নারীর অধিকারের যে আন্দোলন, সেটাকে সম্পন্ন করতে গেলে এখানে দরকার হবে প্রগতিশীল আন্দোলন। নারীর উপর যে সহিংসতা, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন অব্যাহতভাবে চলছে তার বিরুদ্ধেও এবং তা প্রতিবিধানের জন্য সমাজকে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং পুরুষের মধ্যে যারা সচেতন তাদেরকেও এগিয়ে থাকতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও বর্ণগত যে শোষণ, নিপীড়ন, তা থেকে যদি সমাজকে মুক্ত করা না যায়, তাহলে নারী যতই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, নারী যতই অর্থনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন, সমাজ জীবনে তার যে অবস্থান সেটা কখনো সম্মানজনক হবে না, মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে না।'

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, 'পার্বত্য জুম্ম নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পার্বত্য সমস্যা সমাধান ও অত্রাঞ্চলে উন্নয়নের লক্ষে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তাই তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকার নিকট জোর আহ্বান জানান।'

উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটির ন্যায় বান্দরবান জেলা সদরেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষে ঐ দিন সকাল ১০:০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যাগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ-সভাপতি ওয়াইচিং প্রু মারমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন।

মিজোরামে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র পাচারের ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করায় সমিতির প্রতিবাদ

মিজোরামে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র পাচারের ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করার বিরুদ্ধে সমিতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ ২০১৩ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসছিল একে-৪৭সহ বিপুল অস্ত্রের চালান' শিরোনামের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে পিটিআই-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, 'মিজোরামের সিআইডি কর্মকর্তা জোসেফ লালছুয়ানা আরও জানান, অস্ত্র পাচারের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মনি ত্রিপুরা, রবি চাকমা ও সবুজ চাকমা নামে তিন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) সদস্য বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে।' এছাড়া ১০ মার্চের দৈনিক কালের কণ্ঠ, দ্য ডেইলী নিউ এজসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এবং গত ৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে অনুরূপ সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।

সজীব চাকমা স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিতে জানানো হয় যে, উক্ত ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জড়িত নয়। উক্ত সংবাদে বর্ণিত ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জনসংহতি সমিতি উল্লেখ করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: জিল্লুর রহমানের প্রয়াণে জনসংহতি সমিতির সভাপতির শোক জ্ঞাপন

গত ২০ মার্চ ২০১৩ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: জিল্লুর রহমানের প্রয়াণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা গভীর শোক এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনকে গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। শোকবার্তায় শ্রী লারমা আরো বলেন, মরহুম মো: জিল্লুর রহমান ছিলেন দেশের একজন বরেণ্য দেশপ্রেমিক, নিবেদিত প্রাণ ও প্রবীণ রাজনীতিক। বাংলাদেশের আদিবাসী জাতি ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও অধিকারের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আন্তরিক। তাঁর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং দেশ একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদকে হারালো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জুরাছড়ি গণ-সমাবেশে সন্তু লারমা সরকার জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন না করে বিগত ১৫ বছরে ধরে সরকার মানুষকে দিবাস্বপ্ন দেখিয়ে ধোঁকা দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বললেও চুক্তি মানে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাঙামাটি সফরে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে কোন কথা না বলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কথা বলে গেলেন।

রাঙ্গামাটি'র জুরাছড়ি উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে গত ১৮ মার্চ ২০১৩ জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এক কথা বলেন। জনসংহতি সমিতি জুরাছড়ি থানা শাখার সদস্য সচিব মায়াচান চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জুরাছড়ি উপজেলার পরিষদ চেয়ারম্যান প্রবর্তক চাকমা, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, যুব সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক রিপেশ চাকমা প্রমুখ।

চুক্তিবিরোধী ও জুম্মস্বার্থবিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে শ্রী লারমা আরো বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সরকারের মদদপুষ্ঠ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। এদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা এবং চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বিভিন্ন শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জুরাছড়ি শাখা : রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে গত ১৮ মার্চ ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি জুরাছড়ি থানা শাখার তৃতীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইমন চাকমাকে সভাপতি, সুমন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, পলাশ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে দু'বছর মেয়াদী ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি জুরাছড়ি থানা কমিটি গঠন করা হয়।

জীবতলী শাখা : 'সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ হোন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ৩১ মার্চ ২০১৩ রাঙামাটি সদরের হাজার মাণিক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে জীবতলী ইউনিয়ন যুব সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক শাখা সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। জীবতলী ইউনিয়ন যুব সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা।

সোনামনি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি গুণেন্দু বিকাশ চাকমা, জনসংহতি সমিতি সদর থানা শাখার সভাপতি অরবিন্দু চাকমা, মহিলা সমিতির সভাপতি জড়িতা চাকমা, যুব সমিতি সদর থানা শাখার সভাপতি শোভন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশ শেষে সোনামনি চাকমাকে সভাপতি, কিরন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রাঙায়ে চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

রাজস্থলী শাখা : গত ১ মার্চ ২০১৩ রাঙ্গামাটি'র রাজস্থলী উপজেলার ডাক্তার পাড়ায় রাজস্থলী থানা যুব সমিতি'র সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। পুলুখৈই মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র জেলা শাখার সভাপতি গুণেন্দু বিকাশ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কিশোর কুমার চাকমা, জেলা যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, যুব সমিতির সভাপতি সুনির্মল দেওয়ান প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, রাজন তনচঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক, উচ্চনু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজস্থলী যুব সমিতি থানা শাখা গঠন করা হয়।

রামগড়ে জুম্ম নারী শিশু ধর্ষণ ঘটনায় ৪ সংগঠনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ২৭ মার্চ ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি যৌথ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত ধর্ষণ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অব্যাহতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী শিশু ও নারীর উপর এধরনের ধর্ষণ ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এছাড়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবিলম্বে ধর্ষণকারী ও গ্রেফতারকৃত মো: বেলাল হোসেনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও তার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ ২০১৩ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নে মো: বেলাল হোসেন নামের অষ্টম শ্রেণীর এক বাঙালি সেটেলার ছাত্র কর্তৃক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া আদিবাসী এক মারমা কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়।

মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা ও যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা স্বাক্ষরিত এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'সাম্প্রতিক কালে প্রশাসন কর্তৃক এ ধরণের কোন কোন ধর্ষণ বা সহিংস ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার করার জন্য আমরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে চাই যে, এ পর্যন্ত এ ধরণের কোন অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে দেখা যায়নি।'

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, অনেক ক্ষেত্রে এসব ঘটনায় যারা ভিকটিম তারাই নানা হয়রানির শিকার হয় এবং এ পর্যন্ত সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে দেখা যায়নি।'

বিলাইছড়ি গণসমাবেশে সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার উন্নয়নের নামে যা কিছু করছে তা জুম্ম স্বার্থ বিরোধী

রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি স্টেডিয়ামে গত ৫ এপ্রিল ২০১৩ সকাল ১১টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ থানা শাখা সম্মেলন উপলক্ষে গিরীসূর শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় গণসঙ্গীত, জাতীয় ও দলীয় সঙ্গীত পরিবেশনায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এক বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণসমাবেশে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিলাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি শুভমঙ্গল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রলাল চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান

নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক শান্তিবিজয় চাকমা, বিলাইছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সুনিল কান্তি দেওয়ান, জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, সাবেক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্র লাল চাকমা, বিলাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব নিহীত রয়েছে। চুক্তি যদি বাস্তবায়ন না হয় তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আজ ১৫ বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়নি। ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য আইন করা হলেও আইনটি চুক্তিবিরোধী হওয়ায় তা সংশোধনের দাবি জানানো হয়েছিল। সে আইনটি সংশোধনে এ পর্যন্ত বহুবার সভা হয়েছে, সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে না। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে বাকি সময়ে যে কিছু করবে এটা তিনি বিশ্বাস করেন না তা উল্লেখ করে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলছে। চুক্তি বাস্তবায়িত না করে সরকার জুম্মদের সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ সামগ্রিক জীবনধারাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। জুম্ম জনগণ সরকারকে পার্বত্য চুক্তি করতে সরকারকে বাধ্য করেছিল। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আবার যেখানে যে রকম সংগ্রাম প্রয়োজন সেখানে সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে জুম্মদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। গণসমাবেশে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, যে সকল জুম্ম আওয়ামী লীগ ও বিএনপি করেন তাদেরকে প্রশ্ন করুন– যে দল জুম্মদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, যে দল পার্বত্য চুক্তিকে অস্বীকার করে, জুম্মরা কেন সেই দল করবে?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সরকারের সিদ্ধান্তকে জুম্ম জনগণের জন্য নতুন বিষফোঁড়া হিসেবে অভিহিত করে সন্তু লারমা

বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাঙ্গামাটি সফরে এসে শুধু ভোট চেয়ে গেলেন আর কিছু উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে যা কিছু হচ্ছে তা জুম্ম স্বার্থ বিরোধী। পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধের সময়ও নানা মুখরোচক কথাবার্তা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল উচ্ছেদকৃতদের অন্যত্র যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হবে। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলবে। এসব কথায় সেসময়ও জুম্ম সমাজের অনেকেই খুশি হয়েছিল। একমাত্র মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই কাপ্তাই বাঁধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কাপ্তাই বাঁধ জুম্মদের ধ্বংস করেছে। কাপ্তাই বাঁধের মতো আবারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জুম্মদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করবে। দীপঙ্কর তালুকদার-বীর বাহাদুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বললেই লাফিয়ে উঠেন। অথচ রাঙ্গামাটি কলেজটিও আজ ভালোভাবে চলছে না। রাঙ্গামাটি হাসপাতালটি ভালোভাবে চলছে না। এদিকে তাদের কোন নজর নেই।

চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের তালবাহানায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সন্তু লারমা আরো বলেন, সরকার যদি ভাবে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষ সংখ্যায় কম। তারা আজ দুর্বল হয়ে গেছে, আন্দোলন করতে পারবে না। এটা যদি ভেবে থাকে তাহলে ভুল করবে। নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা জুম্মদের আছে। জুম্ম জনগণ বেঁচে থাকার জন্য জীবনকে জয় করতে শিখেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করতে শিখেছে।

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর প্রয়াণে জনসংহতি সমিতির সভাপতির শোকবার্তা

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী যোদ্ধা বিনোদ বিহারী চৌধুরীর প্রয়াণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা গভীর শোক এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। গত ১০ এপ্রিল ২০১৩ রাত প্রায় ১০:০০ টায় বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী ১০৩ বছর বয়সে কলকাতার ফর্টিজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শোকবার্তায় শ্রী লারমা আরো বলেন, তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন দেশের একজন বরেণ্য দেশপ্রেমিক, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, আজীবন আপোষহীন এক বিপ্লবী। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারবঞ্চিত জুম্ম জাতিসহ বাংলাদেশের আদিবাসী জাতি ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও অধিকারের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল, আন্তরিক ও সোচ্চার। তাঁর প্রয়াণে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং দেশ একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, আজীবন আপোষহীন ও নির্ভীক এক বিপ্লবীকে হারিয়েছে বলে শ্রী লারমা তাঁর শোকবার্তায় উল্লেখ করেন।

আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন সংক্রান্ত এশিয়া-প্যাসিফিক আদিবাসী যুবদের প্রস্তুতিমূলক সভায় এইচডব্লিউএফের প্রতিনিধির যোগদান

গত ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৩ ফিলিপাইনের বাগিও সিটিতে অনুষ্ঠিত 'আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন সংক্রান্ত এশিয়া-প্যাসিফিক আদিবাসী যুবদের প্রস্তুতিমূলক সভায়' হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক চন্দ্রা ত্রিপুরা যোগদান করেছেন। এশিয়া-প্যাসিফিক ইন্ডিজিনাস ইয়ুথ নেটওয়ার্ক ও ল্যান্ড ইজ লাইফ-এর যৌথ উদ্যোগে 'আদিবাসী প্রেক্ষাপট ধারনকরণ : আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার অগ্রায়নে আদিবাসী যুব উদ্যোগকে সম্পৃক্তকরণ' শীর্ষক শ্লোগানকে সামনে রেখে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে আগামী ২০১৪ সালে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ বিশ্ব সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশে ও অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে আদিবাসীদের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এশিয়া প্যাসিফিক যুবদের প্রস্তুতিমূলক এ সভায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল এবং ল্যাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৫৫ জন আদিবাসী যুব প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী আগামী ৯-১২ জুন ২০১৩ নরওয়ের আলটায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের প্রস্তুতিমূলক সভায় পেশ করা হবে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন স্থগিত রাখার দাবিতে পিসিপির মানববন্ধন

গত ২২ এপ্রিল ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসন প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল

৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ প্রকাশিত ও প্রচারিত। টেলিফোন- +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা